দয়ানন্দ হিন্দুর আদর্শ সংস্কারক।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

অভিব্যক্ত।

দয়ানন্দ সমিতি কর্ত্তৃক প্রকা।। ২৩।১৮

Calcutta,

Published by the Dayananda Samiti

বঙ্গাব্দ ১৩০৭।

[illegible] প্রেস।

মূল্য ৵০ তিন আনা মাত্র।

তারিখে [illegible]

সংখ্যা

দয়ানন্দ হিন্দুর আদর্শ সংস্কারক।

যে রুগ্ন তাহারই চিকিৎসকের প্রয়োজন। যে বিকৃত তাহারই সংস্কারকের প্রয়োজন। যাহারা বিপন্ন বা পথভ্রান্ত, তাহাদিগের পক্ষেই পরিচালকের প্রয়োজন। নানা কারণে হিন্দু এখন রুগ্ন, সুতরাং হিন্দুর চিকিৎসক চাই। হিন্দু এখন বিকৃত, সুতরাং হিন্দুর এক জন সংস্কারক চাই। হিন্দু বহু শতাব্দী হইতে বিপন্ন ও পথভ্রান্ত হইয়া সংসারারণ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। অমারজনীর অন্ধকারে পথিক যেরূপ অরণ্যের ভিতর বসিয়া বসিয়া অশ্রুপাত করিতে থাকে, হিন্দুও সেইরূপ বহু যুগ হইতে পথের উদ্দেশ না পাইয়া অশ্রুপাত করিতেছে। সুতরাং হিন্দুর এক জন পরিচালক চাই,—হিন্দুর এক জন সংস্কারক চাই। কিন্তু হিন্দুর সংস্কারক কে? হিন্দুর সংস্কারক কে হইতে পারেন? তদুত্তরে আমি বলিব দয়ানন্দ সরস্বতী। দয়ানন্দ সরস্বতী কে?

দয়ানন্দ সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী,—ঊর্দ্ধরেতা ব্রহ্মচারী, দয়ানন্দ পণ্ডিত,—দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত, দয়ানন্দ বেদব্যাখ্যাতা, দয়ানন্দ আর্য্যসমাজের স্থাপয়িতা। এই ত গেল দয়ানন্দের সাধারণ পরিচয়। এখন দয়ানন্দের কিছু বিশেষ পরিচয় আবশ্যক।

---

* দয়ানন্দ সমিতির প্রথম বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে বিগত ১৮ই মাঘ রবিবার, তারিখে আলবার্ট হলে শ্রীযুক্ত [illegible] মুখোপাধ্যায় মহাশয় দয়ানন্দ হিন্দুর আদর্শ সংস্কারক বিষয়ে যে বক্তৃতা করেন, নিম্নলিখিত বক্তৃতা তাহার সারাংশ মাত্র।

গুজরাটের অন্তর্গত কাটিবার বিভাগের মর্ভিনগরে বা তৎসন্নিহিত কোন পল্লিতে সম্বতের ১৮৮১ অব্দে দয়ানন্দ জন্মপরিগ্রহ করেন। সম্ভবতঃ দয়ানন্দের আদি নাম মূলশঙ্কর ছিল। তাঁহার পিতা এক জন ধনী ও সম্ভ্রান্ত লোক ছিলেন। দয়ানন্দ বালককাল হইতে অত্যন্ত মেধাবী। এই কারণ চতুর্দ্দশ বৎসরে পদার্পণ করিবার পূর্ব্বেই তিনি সমগ্র যজুর্ব্বেদ কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলেন, এবং তদ্ভিন্ন শব্দরূপাবলী প্রভৃতি কএক খানি গ্রন্থেও ব্যুৎপন্ন হইয়া উঠেন। তিনি যেমন বাল্যকাল হইতেই মেধাবী, সেইরূপ বাল্যকাল হইতেই সংসারের প্রতি বীতশ্রদ্ধ। তিনি ইচ্ছা করিলে সংসারের সকল প্রকার সুখ সম্ভোগ করিতে পারিতেন, তিনি ইচ্ছা করিলে যাঁর পর নাই সুখ ও স্বচ্ছন্দতায় কালাতিপাত করিতে সমর্থ হইতেন। কিন্তু তিনি তাহা করিতে পারিলেন না। কারণ বৈরাগ্যের যে অগ্নি তাঁহার অন্তরে অল্পে অল্পে প্রধূমিত হইতেছিল, ক্রমে তাহা জ্বলন্ত হইয়া উঠিয়া তাঁহাকে সংসার হইতে বহিষ্কৃত করিয়া লইয়া গেল। বলা বাহুল্য যে তিনি এক দিন রাত্রিকালে কোন বন্ধুর গৃহে গমন করিবার ছল করিয়া গৃহনিষ্ক্রান্ত হইলেন। তখন তাঁহার বয়ঃক্রম একুশ বৎসর হইবে। তাহার পর প্রায় দুই বৎসর পরে নর্ম্মদা-তটবর্ত্তী চানোদ-কল্যাণী নামক স্থানে পূর্ণানন্দ সরস্বতীর নিকট তিনি সন্ন্যাসাশ্রমে দীক্ষিত হইলেন। তখন তাঁহার নাম দয়ানন্দ সরস্বতী হইল। তদনন্তর তিনি ভারতের নানাস্থানে পরিভ্রমণ করিলেন। তিনি যে স্থানে কোন সিদ্ধপুরুষের সন্ধান পাইতেন, সেই স্থানেই উপস্থিত হইতেন। যে স্থানে সন্ন্যাসী বা দণ্ডীদিগের সম্প্রদায় দেখিতেন, দয়ানন্দ সেই স্থানেই বিনীত চিত্তে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগের নিকট নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতেন। এতদ্ভিন্ন আর কোথা কোনও মহাত্মা বা মহাপুরুষ অবস্থিতি করিতেছেন কি না, তিনি এই কথাও আগ্রহ সহকারে তাঁহাদিগের নিকট জানিয়া

লইতেন। এই প্রকারে যোগের নিগূঢ় তত্ত্ব জানিবার উদ্দেশে, প্রকৃত যোগী ও সিদ্ধপুরুষের উদ্দেশে, তিনি ভারতের বহু স্থান পর্য্যটন করিলেন। তিনি এই নিমিত্ত শারীরিক ক্লেশ স্বীকার করিতেও ক্রটি করিলেন না। তিনি এই জন্য দুর্গম পথ, দুর্ভেদ্য অরণ্য, দুরারোহ পর্ব্বত, তুষারাবৃত শৈলশৃঙ্গ, জঙ্গলাবৃত বিস্তীর্ণ প্রান্তর এবং আবর্ত্তময়ী তটিনী সকল অম্লান বদনে অতিক্রম করিয়া চলিতে লাগিলেন। কিছুতেই দৃষ্টিপাত নাই, কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ নাই। 'দেহ থাকে থাক যায় যাক, তাহাতে কিছু মাত্র দৃষ্টি নাই। কিন্তু কি উপায়ে মানুষ শান্তিলাভ করিতে পারে, কি উপায়ে মানুষ যোগের নিগূঢ় তত্ত্ব জানিতে পারে, তাহার জন্যই দয়ানন্দ চতুর্দ্দশ বৎসর কাল অতিবাহিত করিলেন। কিন্তু তাহাতেও তাঁহার ক্ষুধা মিটিল না,—তাঁহার সংশয় বিদূরিত হইল না। এমত সময়ে একদিন কোন সাধুর মুখে তিনি মথুরাবাসী এক মহাত্মার সন্ধান পাইলেন, এবং শীঘ্রই তাঁহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

সেই মহাত্মার নাম বিরজানন্দ স্বামী। বিরজানন্দ চক্ষুহীন হইলেও প্রজ্ঞাচক্ষু নামে অভিহিত হইতেন। বিরজানন্দের পাণ্ডিত্য, বিরজানন্দের প্রতিভা, বিরজানন্দের শাস্ত্রদর্শিতা এবং বিরজানন্দের বাক্‌পটুতা অতিশয় অদ্ভুত ছিল। পঞ্চম বৎসর বয়ঃক্রমের সময় বসন্ত রোগে দুই চক্ষু হীন হইয়া পড়িলেও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যাবতীয় শাস্ত্র বিরজানন্দের তুণ্ডাগ্রে নৃত্য করিত। বিরজানন্দের বিষয়ে এস্থলে আর একটি কথা উল্লিখিত হইতেছে যে তিনি আর্ষ গ্রন্থের পক্ষপাতী ছিলেন, এবং অনার্ষ গ্রন্থের বিরোধী ছিলেন। তিনি সর্ব্বদাই বলিতেন যে যাহা ঋষি-প্রণীত গ্রন্থ তাহাই থাকুক, আর যাহা মনুষ্য-প্রণীত গ্রন্থ তাহা পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত হইয়া যাউক। কারণ মনুষ্য-প্রণীত গ্রন্থ ভ্রমপ্রমাদে পরিপূর্ণ। সুতরাং তাহা থাকিলেই মনুষ্যকে ভ্রম-

প্রমাদে জড়িত হইয়া পড়িতে হইবে। ফলতঃ সেই মহাপুরুষ ভারতে বৈদিক ধর্ম্মের পুনরুদ্দীপনারূপ মহাসঙ্কল্প হৃদয়ে ধারণ করিয়া অবস্থিতি করিতেছিলেন। তিনি বৈদিক ধর্ম্মের পতাকা স্কন্ধে লইয়া বসিয়াছিলেন, এবং এমন কোন উপযুক্ত ব্যক্তির অপেক্ষা করিতেছিলেন যাঁহার স্কন্ধে সেই পতাকা অর্পণ করিয়া ইহলোক হইতে অবসৃত হইয়া যাইবেন। এমত সময়ে দয়ানন্দ আসিয়া তাঁহার নিকট দণ্ডবৎ হইলেন। দয়ানন্দ যখন বিরজানন্দের নিকট আগমন করিলেন, তখন তিনি শিষ্যদল পরিবৃত হইয়া অধ্যাপনা কার্য্যে ব্রতী ছিলেন। যাহা হউক দয়ানন্দ আসিয়া বিরজানন্দের নিকট বিনীতভাবে স্বীয় অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। তাঁহার অভিপ্রায় অবগত হইয়া বিরজানন্দ বলিলেন তুমি এক কার্য্য কর। একাল পর্য্যন্ত যাহা অধ্যয়ন করিয়াছ তাহা ভুলিয়া যাও। তোমার নিকট যদি কোন মনুষ্য-প্রণীত গ্রন্থ থাকে, তবে তাহা যমুনার জলে নিক্ষেপ করিয়া আইস। কারণ মনুষ্য-প্রণীত গ্রন্থের আলোক তোমার হৃদয়ে যতদিন প্রতিভাত থাকিবে, আর্ষ জ্ঞানের আলোক তোমার হৃদয়ে ততদিন কিছুতেই প্রতিফলিত হইবে না। দয়ানন্দ তাহাই করিলেন, এবং বিরজানন্দের পাদমূলে উপবিষ্ট হইয়া নূতন ভাবে ও নূতন প্রণালীতে পাঠব্রতে প্রবৃত্ত হইলেন। এক বৎসর দুই বৎসর করিয়া ক্রমে প্রায় সাত বৎসর কাল অতীত হইল। সাত বৎসরের পর দয়ানন্দ আপনার অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া বিরজানন্দের নিকট বিদায়প্রার্থী হইলেন। বিদায়কালে গুরুদক্ষিণার কথা উঠিল। তদুত্তরে বিরজানন্দ বলিলেন—আমি তোমার নিকট গুরুদক্ষিণা চাহি না, আমি কাহারও নিকট কখন গুরুদক্ষিণা লই না। তবে আমি তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছি, এবং তোমাকে এক প্রতিজ্ঞাসূত্রে আবদ্ধ হইবার নিমিত্ত অনুরোধ করিতেছি। তাহা শুনিয়া দয়ানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন সে অনুরোধ

খুলিয়া বলুন।” তখন বিরজানন্দ বলিলেন, আমার অনুরোধ তুমি ইহলোকে যতদিন দেহভার বহন করিবে, মনুষ্যলোকে যতদিন বিচরণ করিবে, ততদিন ভারতক্ষেত্রে বৈদিক ধর্ম্মের পুনরুদ্দীপনার জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিবে; এবং আর্য্যাবর্ত্তে আর্ষগ্রন্থের মহিমা ঘোষণার জন্য সর্ব্বদা সশস্ত্র হইয়া রহিবে। তদুত্তরে দয়ানন্দ বলিলেন তথাস্তু। এই বলিয়া তিনি মথুরা হইতে আগ্রা, কেরোলি, গোয়ালিয়র ও জয়পুর প্রভৃতি স্থান পরিভ্রমণ করিলেন,—কোন কোন সম্প্রদায়ের সহিত তর্কযুদ্ধেও প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু তখনও তাঁহার হৃদয় হইতে সমস্ত সন্দেহ নিরাকৃত হইল না। তাঁহার হৃদয় তখনও বাতান্দোলিত বৃক্ষশাখার ন্যায় একবার এদিকে একবার ওদিকে দুলিতে লাগিল। তিনি একবার ভাবিতে লাগিলেন যে আর্য্যবর বিরজানন্দের নিকট যাহা শুনিলাম তাহা সত্য? অথবা ভারতের চতুর্দ্দিকের লোক যাহা করিতেছে তাহাই সত্য? তিনি একবার ভাবিলেন বেদোক্ত ধর্ম্মই যথার্থ আর্য্যধর্ম্ম? অথবা তাঁহার পিতৃপিতামহাদি পরম্পরাসূত্রে যে শৈবধর্ম্মের যাজনা করিয়া আসিতেছেন তাহাই আর্য্যধর্ম্ম? যে সন্দেহে পরিচালিত হইয়া দয়ানন্দ গৃহ-নিষ্ক্রান্ত হইয়াছিলেন, যে সন্দেহে পরিচালিত হইয়া তিনি চতুর্দ্দশ বর্ষকাল ভারতের নানা স্থান পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন, যে সন্দেহে পরিচালিত হইয়া তিনি মথুরাধামে বিরজানন্দের নিকট আগমন করিয়াছিলেন, বলিতে কি, সে সন্দেহ তখনও তাঁহার হৃদয় হইতে সর্ব্বতোভাবে বিদূরিত হয় নাই। এই কারণ তিনি পুনর্ব্বার বিরজানন্দের নিকট আগমন করিলেন। সুনিপুণ চিকিৎসকেরা যেমন রোগীর সকল অবস্থা শুনিয়া ও সকল লক্ষণ বুঝিয়াই ঔষধের ব্যবস্থা করেন, সুনিপুণ আচার্য্যেরাও সেইরূপ শিষ্যের সকল সন্দেহ শুনিয়া তাহার প্রতিকারার্থ উদ্যত হইয়া থাকেন। বিরজানন্দ দীর

ভাবে দয়ানন্দের সকল কথা শুনিলেন, এবং আপনার প্রদীপ্ত জ্ঞানচ্ছটা বিকীর্ণ করিয়া শিষ্যের হৃদয় হইতে সন্দেহের সমস্ত অন্ধকার বিদূরিত করিয়া দিলেন। তখন দয়ানন্দের হৃদয় মেঘমুক্ত চন্দ্রের ন্যায় সমুজ্জ্বল ভাব ধারণ করিল। তিনি আচার্য্যের পদে পুনর্ব্বার প্রণত হইয়া ভারতে বৈদিক ধর্ম্ম বিস্তারার্থ হরিদ্বারাভিমুখে যাত্রা করিলেন। হরিদ্বারে তখন কুম্ভের মেলা উপস্থিত। শত শত সন্ন্যাসী দণ্ডী, পরমহংস, সাধু, সিদ্ধপুরুষ তথায় সমবেত হইয়াছেন। দয়ানন্দ হরিদ্বারের উচ্চতর ভূমি হইতেই বৈদিক ধর্ম্মের স্রোত উন্মুক্ত করিবার সংকল্প করিলেন। তথায় পাষণ্ডমর্দ্দন নামক পতাকা উত্তোলিত হইল। পতাকার নাম পাষণ্ডমর্দ্দন হইল কেন? পাষণ্ড কি না যাঁহারা বেদবিরোধী বা বেদবৈরী। বেদবিরোধী বা বেদবৈরীদিগকে মর্দ্দিত বা পরাজিত করিয়া বৈদিক ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত করাই সেই পতাকা উত্তোলনের অভিপ্রায় ছিল। সেই পতাকা দেখিয়া অনেক সাধু ও পরমহংস তাঁহার সহিত বিচারার্থী হইয়া আসিলেন। দয়ানন্দ তাঁহাদিগের অনেকের সঙ্গে বিচারও করিলেন। কিন্তু তিনি তদ্দ্বারা বুঝিতে পারিলেন যে ভারতভূমি ঘোর তমিস্রায় সমাবৃত। হিন্দুর সমাজ সহস্র সহস্র আবর্জ্জনায় পরিপূরিত। এই তমিস্রাজাল তিরোহিত করিতে হইলে, এই আবর্জ্জনা সকল অপসারিত করিতে হইলে কঠোর সংগ্রামের প্রয়োজন। সংগ্রামে শান্তিভঙ্গ। দয়ানন্দ ভাবিলেন আমি শান্তির প্রার্থী, আমি মোক্ষের অভিলাষী। তবে আমি শান্তিভঙ্গ করিতে যাইব কেন? চিত্ত-বিক্ষেপ ঘটাইয়া অশান্তির আগুনে পুড়িয়া মরিব কেন? এইরূপ চিন্তার পর ধর্ম্মসংগ্রামে প্রবৃত্ত না হওয়াই স্থিরীকৃত হইল। তখন তিনি মৌনী হইলেন, দেহ ভস্মাচ্ছাদিত করিলেন, গ্রন্থাদি সামগ্রী সকল লোকদিগকে বিলাইয়া দিলেন, এবং যোগরত হইয়া এক নির্জ্জন স্থানে একান্ত ভাবে

বসিয়া রহিলেন। দযানন্দ যোগস্থ হইযা অবিচ্ছিন্ন শান্তির অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। এমত সময়ে এক দিন এক বৈষ্ণবপন্থী সাধু আসিযা দযানন্দের ব্রতভঙ্গ করিলেন। সেই সাধু কতকটা স্পর্দ্ধার সহিত বলিলেন বেদ আবার কি? শ্রীমদ্ভাগবৎ বেদের অপেক্ষা সহস্র গুণে শ্রেষ্ঠ। এই বলিয়া "নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং" ইত্যাদি আবৃত্তি পূর্ব্বক শ্রীমদ্ভাগবতের প্রাধান্য ঘোষণা করিতে লাগিলেন। তখন দয়ানন্দ সুপ্তোত্থিত সিংহের মত গর্জ্জন করিযা বলিলেন কি বল। শ্রীমদ্ভাগবৎ কিনা বেদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ! আর না, আর নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নহে। যে অজ্ঞানতমিস্রায ভারতসমাজ সমাবৃত হইয়াছে, আমি আমার প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিযাও সেই তমিস্রা অপসারণের চেষ্টা করিব। যে ব্রত উদ্‌যাপন করিব বলিযা আচার্য্যদেবের নিকট প্রতিশ্রুত হইয়াছি, আমি সেই ব্রতের জন্য সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিতে পারিলেও কৃতার্থ হইব। এইরূপে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইযা দযানন্দ হরিদ্বার হইতে অবতরণ করিলেন, এবং গঙ্গা প্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে বৈদিক ধর্ম্মের প্রবাহ প্রসারিত করিবার অভিপ্রায়ে তিনি অনুগাঙ্গ প্রদেশের নগর ও জনপদ সকল অতিক্রম করিতে লাগিলেন। তিনি হরিদ্বার হইতে কাম্পিল নগরে আসিলেন, কাম্পিল নগর হইতে ফরাক্কাবাদে আসিলেন, ফরাক্কাবাদ হইতে কাণপুর ও প্রযাগ প্রভৃতি হইয়া বারাণসীধামে উপনীত হইলেন। বারাণসীতে ব্রহ্মবাদের নিশান উড্ডীন হইল। তথাকার আনন্দবাগে মহাসভার অধিবেশন হইল। কাশীনরেশ মহাসভার অধিনায়ক হইলেন। বিশুদ্ধা নন্দ ও বালশাস্ত্রী প্রভৃতি মহারথগণ সমাগত পণ্ডিতবৃন্দের প্রতিনিধি হইয়া স্বামিজীর সহিত বিচার ঘোষণা করিলেন। বিচারে পণ্ডিতগণ দয়ানন্দের নিকট পরাভূত হইলেন। পণ্ডিতগণ ঘোর কোলাহল উত্থাপিত করিলেন। কাশী কাঁপিয়া উঠিল, এবং সেই কম্পনস্রোত চতু-

দিকে গডাইয়া পড়িয়া সমগ্র ভারতকে কাঁপাইয়া তুলিল। সকলেই বলিতে লাগিল দয়ানন্দ আবার কে? তাহার পর দয়ানন্দ বেহারে গমন করিলেন, বঙ্গদেশে আসিলেন এবং মান্দ্রাজ ভিন্ন ভারতের প্রায় সমস্ত বিভাগেই পরিভ্রমণ পূর্ব্বক বৈদিক ধর্ম্মের ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। তিনি কি বোম্বাই, কি পঞ্জাব, কি রাজপুতানা যে স্থানে যাইলেন, সেই স্থানের পণ্ডিতবৃন্দকেই বিচারযুদ্ধে আহ্বান করিলেন। মূর্ত্তিপূজা বেদপ্রতিপাদিত নহে, সুতরাং মূর্ত্তিপূজা মিথ্যা তিনি এই কথা একাকী এক সহস্র হইয়া আর্য্যাবর্ত্তে ঘোষণা করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। দীপ্যমান অগ্নিশিখাকে যেমন কেহই নিবাইতে পারে না, নদীর প্রচণ্ড প্রবাহকে যেমন কেহই রোধ করিতে সমর্থ হয় না, দয়ানন্দের প্রতাপ সেইরূপ কিছুতেই নির্ব্বাপিত হইল না,—দয়ানন্দের গতি সেইরূপ কিছুতেই রুদ্ধ হইয়া রহিল না। এতদ্ভিন্ন তিনি সংস্কৃত পাঠশালা প্রতিষ্ঠিত করিলেন। সায়ণ মহীধরাদি আধুনিক ভাষ্যকর্ত্তাদিগকে বিখণ্ডিত করিয়া বেদভাষ্য প্রচার করিলেন, গোকুলের কল্যাণের নিমিত্ত গোরক্ষিণী সভা স্থাপিত করিলেন, এবং এইরূপে আর্য্যাবর্ত্তের অশেষ হিতসাধক কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের ৩০ শে অক্টোবর তারিখে দেওয়ালির দিবসে দেহান্ত প্রাপ্ত করিলেন। এই ত গেল দয়ানন্দের বিশেষ পরিচয়।

এখন দেখা যাউক দয়ানন্দ হিন্দুর আদর্শ সংস্কারক কি না? তাহা দেখিবার পূর্ব্বে বিচার করা উচিত যে হিন্দু কি, হিন্দুপ্রকৃতি কি, হিন্দুজীবন কি এবং হিন্দুসমাজ কি? পৃথিবীতে এ পর্য্যন্ত যত জাতির আবির্ভাব ও তিরোভাব হইয়াছে, তাহাদিগের সকলের সহিত তুলনায় হিন্দুর একটা বিশেষত্ব আছে। য়িহুদি বল, গ্রীক বল, রোমক বল, মিসরের প্রাচীন অধিবাসিগণ বল এ সকলের

অপেক্ষা হিন্দুতে একটা বিশেষত্ব রহিয়াছে। সে বিশেষত্ব কি? সে বিশেষত্ব হিন্দুর লক্ষ্যানুবর্ত্তিতা। হিন্দুর রীতি প্রকৃতি আলোচনা করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে যেন ইহাঁরা সর্ব্বাগ্রে জীবনের লক্ষ্যস্থির করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। এমত হইতে পারে যে ব্রহ্মাবর্ত্তের পবিত্র প্রদেশে প্রশান্তচিত্ত ব্রাহ্মণগণ জীবনের লক্ষ্য নির্ণয় করিবার নিমিত্তই কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, এবং লক্ষ্য নির্ণীত হইলে পর তবে তাঁহারা সংসারক্ষেত্রে আসিয়া সংসার পাতিয়া বসিয়াছিলেন। এমতও হইতে পারে যে বেদরূপ ব্রহ্মবাণীর ইঙ্গিতেই তাঁহারা জীবনের লক্ষ্য বুঝিয়া লইয়াছিলেন। বেদ ব্রহ্মবাণী কি না তাহা আমি জানি না। তবে হিন্দুরা যে সর্ব্বাগ্রে লক্ষ্যস্থির করিয়াই সংসার বা সমাজের ভিত্তি স্থাপনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তদ্বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্রও সংশয় নাই। হিন্দু কেবল লক্ষ্য নির্ণয় করিয়াই বসিয়া রহিলেন না। তাঁহারা আপনাদিগের সমাজ ও পরিবারকে সেই লক্ষ্যানুবর্ত্তী করিয়াই গঠিত করিয়াছিলেন। আমি স্বীকার করি রোম সৌভাগ্য-সম্পদে উচ্চশির হইয়াছিল, গ্রীস জ্ঞান-গৌরবে-গরীয়ান্ হইয়া উঠিয়াছিল, এবং বাবিলন ও মিসর জাতীয় মহত্ত্বের উচ্চতর শিখরে আরোহণ করিয়াছিল বটে, কিন্তু সৃষ্টির সেই পবিত্র প্রাতঃকালে—মনুষ্যত্বের সেই অপরিস্ফুট উষালোকে হিন্দু ভিন্ন পৃথিবীর কোন জাতিই এই জীবনসমস্যার পূরণ করিতে সমর্থ হয় নাই। মানবজাতির জাতীয় ইতিহাসের পৃষ্ঠা পৃষ্ঠা অনুসন্ধান করিয়া দেখ, এই লক্ষ্যস্থিরতা ও লক্ষ্যানুবর্ত্তিতার ভাব আর কোথাও দেখিতে পাইবে না। অতএব ইহাই হিন্দুর বিশেষত্ব।

হিন্দুর লক্ষ্য সত্ত্বস্ফূর্ত্তি বা ব্রহ্মপ্রাপ্তি। হিন্দুর প্রকৃতি সত্ত্বপরতা, এবং হিন্দুজীবনের ভিত্তি নিবৃত্তিগামিতা। হিন্দু সত্ত্বস্ফূর্ত্তির নিমিত্তই দেহ ধারণ করেন, ব্রহ্মপ্রাপ্তির জন্যই হিন্দু বাঁচিয়া থাকেন। হিন্দু ব্রহ্মের জন্যই

পরিশ্রম করেন, ধনোপার্জ্জন করেন, হিন্দু ব্রহ্মের জন্যই অধ্যয়ন করেন, ভোজন করেন, বিশ্রাম করেন, এমন কি হিন্দু ব্রহ্মের জন্যই পুত্রোৎপাদন করিয়া থাকেন। সুতরাং হিন্দুর চক্ষে সমাজ সর্ব্বপ্রকার স্বার্থের সাধন ক্ষেত্র নহে। হিন্দুর চক্ষে সংসার ঐন্দ্রিয়িক লালসার লীলানিকেতন নহে। হিন্দুর চক্ষে পরিবার বিলাসের কেলিকুঞ্জ নহে, এবং হিন্দুর চক্ষে পরিণীতা পত্নী পাশবিক বৃত্তি চরিতার্থ করিবার সঙ্গিনীও নহে। সৌরজগতে সূর্য্যকে কেন্দ্র করিয়া যেমন গ্রহতারকা সকল পরিভ্রমণ করে, হিন্দু সেইরূপ ব্রহ্মকে কেন্দ্রস্থানীয় করিয়াই কর্ম্মক্ষেত্রে বিচরণ করিয়া থাকেন। অথবা নাবিক যেরূপ অপার বারিনিধির বক্ষে ধ্রুবতারার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই আপনার পোত পরিচালিত করে, হিন্দু সেইরূপ একমাত্র ব্রহ্মের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই সংসার সমুদ্রের তরঙ্গমালা অতিক্রম করিয়া থাকেন। সুতরাং হিন্দুর মত ব্রহ্মপর জাতি আর কোথায় পাইবে? হিন্দুপ্রকৃতির মত ব্রহ্মপরা প্রকৃতিই বা আর কোথায় দেখিবে? নদী-প্রবাহ যেমন সমুদ্রেই প্রধাবিত হয়, অগ্নিশিখা যেমন ঊর্দ্ধেই উত্থিত হয়, হিন্দুর যাবতীয় কার্য্যও সেইরূপ সত্ত্বস্ফূর্ত্তির উদ্দেশেই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। অতএব তুমি যদি প্রতিদিন গঙ্গাস্নান করিয়া আইস, দিবা দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত পূজাহ্নিকে ব্যাপৃত হইয়া থাক, ললাটকে ত্রিপুণ্ড্র রেখায় অঙ্কিত কর, অথবা তোমার সুদীর্ঘ শিখা ঘন ঘন সঞ্চালিত করিয়া কথায় কথায় হিন্দুত্বের স্পর্দ্ধা করিতে থাক, তথাপি তুমি হিন্দু বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিবে না, যদি তোমার জীবনে সত্ত্বস্ফূর্ত্তির নিমিত্ত প্রবল আকাঙ্ক্ষা না থাকে বা তোমার চরিত্রের গতি ব্রহ্মপ্রাপ্তির অভিমুখে প্রধাবিত হইয়া না রহে। তুমি যদি হিন্দু হইতে চাহ, তাহা হইলে ব্রহ্মপ্রাপ্তির জন্য সংসার পাতিয়াছ কি না আগে ভাবিয়া দেখ। ফলতঃ সত্ত্বস্ফূর্ত্তি লইয়াই যে হিন্দুর যাহা কিছু, আমি তাহাই আপনাদিগের নিকট এতক্ষণ বলিলাম।

হিন্দু যদি সত্বস্ফূর্ত্তির জন্যই দেহধারণ করেন, হিন্দু যদি ব্রহ্মপ্রাপ্তির নিমিত্তই দেহভার বহন করিয়া থাকেন, তাহা হইলে হিন্দুর সমাজ বা সামাজিক রীতিনীতিও যে সত্বানুবর্ত্তিনী হইবে তাহা বলাই বাহুল্য। এই কারণ ভারতের সেই গূঢ়দর্শী মহর্ষিগণ চাতুর্ব্বণ্যাদি স্তম্ভচতুষ্টয়ের উপর তাঁহাদিগের সমাজ প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। এখন দেখা যাউক সে স্তম্ভচতুষ্টয় কি কি? তাহার একটির নাম বেদানুগামিতা, অপরটির নাম চতুরাশ্রম, তৃতীয়টির নাম চতুর্ব্বর্ণ এবং চতুর্থটির নাম সংস্কার। হিন্দুর সমাজ যুগযুগান্ত কাল হইতে এই চারিটি স্তম্ভ অবলম্বন করিয়াই অবস্থিত রহিয়াছে। বেদ আপ্তবাণী বলিয়া হিন্দুর নিকট পরিগৃহীত। সুতরাং বেদের সম্মান হিন্দুর নিকট সর্ব্বোপরি। স্থূল ভাবেই হউক আর সূক্ষ্ম ভাবেই হউক মানবজাতির যাবতীয় তত্ত্ব বেদমধ্যে নিহিত আছে বলিয়া হিন্দু বিশ্বাস করেন। তদ্ভিন্ন বেদে ব্রহ্মবিদ্যা বিশেষ ভাবে কথিত হইয়াছে। সুতরাং বেদানুশরণ বা বেদানুগমন না করিলে সত্বস্ফূর্ত্তির সম্ভাবনা কোথায়? তাই বেদবিশ্বাস হিন্দুর শিরায় শিরায় প্রতিষ্ঠিত,—তাই বেদের নামে হিন্দুর আপাদমস্তক রোমাঞ্চিত। হিন্দু বৌদ্ধবিপ্লবে বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন সত্য, হিন্দু আরঙ্গজেব ও জঙ্গিস্ খাঁর নিষ্কোষিত অসির নিকট কণ্ঠার্পণ করিতেও অকুণ্ঠিত হইয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তথাপি হিন্দু বেদের প্রতি অবিশ্বাস দেখাইতে পারেন নাই। তাহার পর চতুরাশ্রমের কথা। চতুরাশ্রম কি কি? ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস। ব্রহ্মচর্য্য কিছু না রিপুদমন। রিপুদমন কিসে হয়? বিলাসবর্জ্জন ও কঠোরতা সাধন করিলে হয়। এই কারণ ব্রহ্মচারীকে কঠোর ও বিলাসবিতৃষ্ণ হইতে হইবে। ব্রহ্মচারীকে আর কি করিতে হইবে? না অগ্নিপরীক্ষিত হইতে হইবে। কেননা পাছে সংসারে প্রবেশ করিলে তাঁহাকে

প্রলোভনের অগ্নি ভস্মীভূত করিয়া না ফেলে। আর কি হইতে হইবে? না ব্রহ্মচারীকে বায়ুপরীক্ষিত হইতে হইবে। কেন? না পাছে কালের প্রচণ্ড বাত্যায় তাঁহাকে বিঘূর্ণিত করিয়া না ফেলে। ব্রহ্মচারীকে আর কি হইতে হইবে? না পথপরীক্ষিত হইতে হইবে। কেন? না পাছে সংসারের অতি ভয়াবহ ও পিচ্ছিল পথে তাঁহাকে পথভ্রান্ত করিয়া না ভুলে। পথপরীক্ষিত, অগ্নিপরীক্ষিত এবং বায়ুপরীক্ষিত হইলে পর ব্রহ্মচারী সমাবর্ত্তন করিয়া সংসারে প্রবেশ করিবেন। অথবা ইচ্ছা করিলে তিনি আজীবন উর্দ্ধরেতা হইয়া থাকিবেন। ব্রহ্মচর্য্যের কি অসাধারণ মহিমা! ব্রহ্মচর্য্যের কি অভাবনীয় প্রভাব! আমাকে যদি জিজ্ঞাসা কর যে ভারতভূমি উন্নতির উচ্চতর শিখরে আরোহণ করিয়াছিল কেন? আমি বলিব তাহার মূল ব্রহ্মচর্য্য। আমাকে যদি জিজ্ঞাসা কর যে হিন্দুরা পৃথিবীতে জ্ঞান ও ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক হইয়াছিলেন কেন? আমি বলিব তাহার কারণ ব্রহ্মচর্য্য। আমাকে যদি জিজ্ঞাসা কর যে হিন্দুরা সাহিত্য সম্পদে পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন কেন? তাহা হইলেও আমি বলিব তাহার কারণ ব্রহ্মচর্য্য। মানবজাতির সাহিত্যে ত কত গ্রন্থের আবির্ভাব হইতেছে, কত গ্রন্থের তিরোভাব ঘটিতেছে। পৃথিবীতে ত কত গ্রন্থকার অভ্যুদিত হইতেছেন, কত গ্রন্থকার বিলুপ্ত নামা হইয়া যাইতেছেন। কালের অবিশ্রান্ত ও উদ্দাম স্রোত তাহাদিগকে কোথায় লইয়া ফেলিতেছে তাহা কে বলিতে পারে? কিন্তু মহাভারতের তিরোভাব ঘটিল না কেন? আর মহাভারতকার কৃষ্ণ দ্বৈপায়নের নামই বা বিলুপ্ত হইল না কেন? মহাভারত আজিও মহাভারত কেন? মহাভারত আজিও আপনার গৌরবে আপনি উচ্ছ্রিত কেন? অথবা মানবজাতির সমগ্র সাহিত্যের মধ্যে মহাভারত আজিও অদ্বিতীয় এবং অতুলনীয় হইয়া রহিয়াছে কেন? ইহার উত্তরে আমি

বলিব যে বুদ্ধি দ্বারা মহাভারত বিরচিত হইয়াছে, সে বুদ্ধি তোমার আমার মত বুদ্ধি নহে ;—সে বুদ্ধি ব্রহ্মচর্য্য-প্রসূত বুদ্ধি। অতএব আপনারা এখন বুঝিতে পারিতেছেন যে ব্রহ্মচর্য্যই হিন্দুর যাবতীয় উন্নতির নিদান। আমার ধ্রুব বিশ্বাস যে ভারতসমাজ হইতে যে দিন ব্রহ্মচর্য্যের প্রথা উঠিয়া গিয়াছে, সেই দিন হইতে আমাদিকে দুর্গতির পর দুর্গতির তরঙ্গে নানাদিকে ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছে। সুতরাং যদি কেহ অন্তরের সহিত হিন্দুর উন্নয়ন কামনা করিয়া আমাকে তাহার উপায় জিজ্ঞাসা করেন, তাহা হইলে আমি তাঁহাকে সহস্রবার বলিব যে পুনরায় ব্রহ্মচর্য্য প্রবর্ত্তিত করিবার নিমিত্ত বদ্ধপরিকর হউন।

এখন দেখিতে হইবে গৃহস্থ হিন্দুর পক্ষে কর্ত্তব্য কি ? যাহাতে হৃদয়ের সাধু ও মহতী বৃত্তি সকল বিকশিত হয়, যাহাতে সত্ত্ব ভাবের উদ্দীপনা হয়, যাহাতে পুত্রপরিবার-পরিবেষ্টিত হইয়াও মানুষ পরমাত্ম চিন্তনে সমর্থ হয়, এমত কোন ব্যবস্থা হিন্দুর গার্হস্থ্যধর্ম্মে আছে কি না ? আমি বলি আছে। একথা বোধ হয় অনেকেই অবগত আছেন যে, গৃহস্থ হিন্দুকে পঞ্চ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে হয়। পঞ্চ যজ্ঞের অনুষ্ঠান বড় সামান্য ব্যাপার নহে। পঞ্চ যজ্ঞের ফল কি ? পঞ্চ যজ্ঞের অনুষ্ঠানে মানুষ, আত্মার অমরত্বে বিশ্বাসী হয়, আচার্য্য ও দেবতাদিগের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ হয়, এবং ইহলোকের সহিত পরলোকের সম্পর্ক বুঝিতেও সমর্থ হয়। এতদ্ভিন্ন পঞ্চযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে মানবহৃদয় বিশ্ব-প্রপঞ্চবাসী যাবতীয় প্রাণীর সহিত একটা অতি গাঢ় ও অবিচ্ছিন্ন মৈত্রীসূত্রেও সম্বদ্ধ হইয়া থাকে। সুতরাং এখন ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে হিন্দুর গার্হস্থ্যনীতির মধ্যেও সত্ত্বস্ফূর্ত্তির বিলক্ষণ ব্যবস্থা রহিয়াছে। গার্হস্থ্যের পর বানপ্রস্থ। বানপ্রস্থের পথেও সত্ত্বো-ন্মেষণের ব্যবস্থা। বানপ্রস্থের পর সন্ন্যাস,—সন্ন্যাস ত সত্ত্বের সম্যক স্ফূর্ত্তির উপরেই প্রতিষ্ঠিত।

হিন্দুর আশ্রমনীতি সকল যে সত্ত্বানুসারিণী এতক্ষণ আমি এই কথাই বুঝাইয়া আসিলাম। এখন হিন্দুর বর্ণভেদ প্রণালীর ভিতর সত্ত্বস্ফূর্ত্তির কোন ব্যবস্থা আছে কি না তাহাই আমার আলোচ্য। কতকগুলি ইংরাজি-বিভ্রান্ত নব্য সংস্কারকের ধারণা যে বর্ণভেদ প্রণালী দ্বারাই ভারতের সকল প্রকার অনর্থ সাধিত হইয়াছে। এ বিশ্বাস আমারও এক সময়ে ছিল। তখন আমারও মনে হইত যে ব্রাহ্মণগণ কেবল আপনাদিগের নিরঙ্কুশ প্রভুত্ব বিস্তারের জন্যই ভারতসমাজে এই বিষবৃক্ষের বীজ বপন করিয়া গিয়াছেন। সত্য সত্যই আমি বর্ণভেদ প্রণালীকে বিষবৃক্ষ বলিয়া মনে করিতাম। এই কারণ এই কুরীতির প্রতিকূলে আমি অনেকবার দণ্ডায়মান হইয়াছি,—এমন কি ইহাকে এককালে উন্মূলিত করিবার অভিপ্রায়ে সময়ে সময়ে কুঠারক্ষেপেও অগ্রসর হইয়াছি। কিন্তু এখন আমার এ বিশ্বাস ভ্রান্ত বলিয়াই বোধ হইয়াছে। তজ্জন্য আমি ইহা বর্জ্জন করিয়াছি, এবং আপনাদিগের নিকট অসঙ্কোচে ও মুক্তকণ্ঠে উল্লেখ করিতেছি যে কি জাতিগত কি ব্যক্তিগত কোন প্রকার অনিষ্টের উদ্দেশেই ভারতক্ষেত্রে বর্ণবিভাগের প্রথা প্রবর্ত্তিত হয় নাই। যাঁহারা বর্ণভেদের তত্ত্ব ভালরূপে বুঝিয়াছেন, যাঁহারা চাতুর্ব্বর্ণ্যের নিগূঢ় মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন, তাঁহারা আমার সহিত একমত হইয়া এ কথা স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার করিবেন যে হিন্দুর আশ্রমনীতি সকল যেমন সত্ত্বানুসারিণী, হিন্দুর বর্ণভেদ প্রণালীও সেইরূপ সত্ত্বানুসারিণী। এই কারণ বর্ণভেদ প্রণালী শূদ্রকে কখন চিরকাল শূদ্র হইয়া থাকিতে বলে না, বর্ণভেদ প্রণালী কখন বৈশ্যকেও চিরকাল বৈশ্য হইয়া থাকিতে বলে না, এবং বর্ণভেদ প্রণালী বর্ণগত মাহাত্ম্যকেও কখন বীর্য্যগত বা ক্ষেত্রগত করিয়া রাখিতে চাহে না। এক কথায় বলিতে হইলে আমি ইহাই বলিব যে হিন্দুর বর্ণভেদ প্রথা উন্নয়নের পক্ষপাতী। কোন মানুষের বা

কোন সম্প্রদায়ের অবনয়ন বা অধোগতির জন্য মহর্ষিগণ এই প্রথা প্রবর্ত্তিত করিয়া যান নাই। হিন্দু জন্মান্তরবাদী। সেই কারণ হিন্দু ক্রমবাদী, এবং আমার বিশ্বাস হিন্দু ক্রমবাদী বলিয়াই বর্ণবিভাগের পক্ষপাতী। মূল কথা বর্ণবিভাগ যে ক্রমোন্নতির সূত্রেই গ্রথিত তাহা আর বিশেষ করিয়া বলিতে হইবে না। মানুষ একেবারেই ব্রহ্মপ্রাপ্তির অধিকারী হইবে, মানুষ একেবারেই সাত্ত্বিকভাব অমল ধবল শান্তোজ্জ্বল লোকে বিচরণ করিবে, অথবা মানুষ একেবারেই মোক্ষরূপ মহোচ্চ পদবীতে অধিরূঢ় হইয়া আনন্দের অপার সাগরে ভাসমান হইয়া রহিবে, এ কথা হিন্দু কোন দিনই বিশ্বাস করেন না, এবং করেন না বলিয়াই আর্য্যাবর্ত্তের ধর্ম্মাচার্য্যগণ চাতুর্ব্বর্ণ্যরূপ সোপানপরম্পরা বিরচিত করিয়া গিয়াছেন। উপস্থিত বিষয়ে আমার আর একটি কথা বলিবার রহিয়াছে। সেটি সংস্কারের কথা। হিন্দু মাত্রেই যে সংস্কারের পক্ষপাতী তাহা আপনাদিগের সকলেই জানেন। উপনয়নাদি সংস্কারসমূহ হিন্দুর পক্ষে অপরিহার্য্য। সংস্কারের অপরাপর ফল কি তাহা আমি বিশেষরূপে জানি না। তবে এইমাত্র বলিতে পারি যে সংস্কার দ্বারা কর্ম্মশুদ্ধি সাধিত হয়। কেবল কর্ম্মশুদ্ধি সাধিত হয় না, আমার মনে হয় সংস্কার কর্ম্মসমূহকে ব্রহ্মোদ্দিষ্ট করিয়া তুলে। সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে যে হিন্দুর সংস্কারপ্রণালীও সত্ত্বস্ফূর্ত্তির সহায়ক। হিন্দুর সামাজিক প্রকৃতি সম্বন্ধে যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত ভাবে আমি এতক্ষণ যাহা বলিয়া আসিলাম, তদ্দ্বারা এখন প্রতিপন্ন হইতেছে যে যে কএকটি বিষয়ের উপর আমাদিগের সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়া রহিয়াছে, তাহার সকল গুলিই সত্ত্বভাবের সহায়ক ভিন্ন বাধক নহে।

হিন্দু কি, হিন্দুপ্রকৃতি কি, এবং হিন্দুসমাজ কি তাহা এক প্রকার বুঝা গেল। এখন হিন্দু সংস্কারক কে তাহাই আমাদিগকে বুঝিতে

হইবে। আমার বিবেচনায় সংস্কারকের সাধারণতঃ পাঁচটি লক্ষণ থাকা চাই। সে পাঁচটি লক্ষণ এই:—(১) জাতিপ্রিয়তা, (২) জাতিজ্ঞতা, (৩) অস্তিপ্রিয়তা, (৪) সত্যনিষ্ঠা, এবং (৫) আত্মবিলয়। প্রথমতঃ সংস্কারককে জাতিপ্রিয় হইতে হইবে। যে জাতির ভিতর তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, যে জাতির ভিতর তিনি পরিবর্দ্ধিত হইয়াছেন, যে জাতির স্নেহ মমতা এবং শক্তি ও সহায়তা লাভ করিয়া তিনি মনুষ্যের মত মনুষ্যলোকে বিচরণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, সে জাতির সহিত তাঁহাকে প্রীতির অবিচ্ছিন্ন সূত্রে আবদ্ধ থাকিতে হইবে। সে জাতির সুখে দুঃখে সম্পদে ও বিপদে তাঁহাকে একীভূত হইয়া রহিতে হইবে। তুমি আপনাকে হিন্দুর সংস্কারক বলিয়া পরিচিত করিতেছ; অথচ তুমি হিন্দুর শিক্ষা লইয়া পরিহাস কর, হিন্দুর সাহিত্য প্রসঙ্গে ঘৃণার তীব্র হলাহল উদ্গীরণ কর, এবং হিন্দুর রীতি নীতি ও পরিচ্ছদ পদ্ধতির সহিত কোনরূপ সম্পর্ক রাখিতে না পারিলেই আপনাকে সার্থকজন্মা বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাক। কেবল ইহা নহে,—তুমি হিন্দু বলিয়া পরিচিত হইতে লজ্জাবোধ কর, হিন্দুস্থানে জন্মগ্রহণ করিয়াছ বলিয়া আক্ষেপ প্রকাশ কর, এবং সর্ব্বপ্রকারে হিন্দুত্বের সীমা বহির্ভূত হইয়া থাকিতে পারিলেই আপনাকে ধন্য বলিয়া মনে করিয়া থাক। জিজ্ঞাসা করি তোমাকে সংস্কারক বলিয়া স্বীকার করিব কি না? যদি সমগ্র দেশ তোমাকে সংস্কারক বলিয়া অভিবাদন করে, তাহা হইলেও আমি বলিব সমগ্র দেশ রসাতলে গিয়াছে নচেত তোমার মত অজাতিপ্রিয় ব্যক্তিকে সংস্কারকের পূজ্যাসন প্রদান করিবে কেন? তাহার পর জাতিজ্ঞতা চাই। জাতিজ্ঞতা কি? জাতিবিশেষের ভিত্তি প্রকৃতি ও অস্থি মজ্জার সহিত পরিচিত হওয়ার নামই জাতিজ্ঞতা। সুতরাং সংস্কারককে জাতীয় সাহিত্যে অভিজ্ঞ হইতে হইবে। কারণ জাতীয় সাহিত্যের মধ্যেই জাতীয় মনের

চিহ্ন অঙ্কিত রহিয়াছে। জাতীয় মনের সহিত সুপরিচিত না হইলে জাতীয় প্রকৃতি বুঝা যায় না। আবার জাতীয় প্রকৃতি না বুঝিলে জাতিগত অভাব বা অধোগতি সম্পর্কে কোন কথাই বিচার করিতে সমর্থ হওয়া যায় না। চিকিৎসকের পক্ষে নাড়ীজ্ঞান যেরূপ অপরিহার্য্য, সংস্কারকের পক্ষে জাতিজ্ঞানও সেইরূপ অপরিহার্য্য। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই ব্যাধিপ্রপীড়িত দেশে নাড়ীজ্ঞানশূন্য চিকিৎসকের সংখ্যাই অধিক, এবং অধিক বলিয়াই আমাদিগের ব্যাধির প্রকোপও সমধিক। তাহার পর অস্তিপ্রিয়তার কথা। অস্তিপ্রিয়তা সংস্কারকের একটি অপরিহার্য্য লক্ষণ। নাস্তিপ্রিয় লোক সংস্কারক হইতে পারেন না। যাঁহারা পদে পদে বিধ্বংসিনী নীতির অনুসরণ করিয়া চলেন, তাঁহারা সংস্কারকের সমুন্নত আসনে অধিরূঢ় হইতে সমর্থ হয়েন না। সংস্কারককে নবীনতা অপেক্ষা প্রাচীনতার পক্ষপাতী হইতে হইবে। যাহা আছে তাহা থাকিলে যদি ইষ্ট সাধিত হয়, তবে সংস্কারক তাহা রাখিবার চেষ্টা করিবেন। যাহা জীর্ণ হইয়া গিয়াছে সংস্কারক তাহার শ্রীসম্পাদন করিয়া তুলিবেন, কিংবা যাহা পতিত বা পতনোন্মুখ হইয়া রহিয়াছে, সংস্কারক তাহা প্রতিষ্ঠিত করিতে সচেষ্ট হইবেন। সংস্কারককে ধীর ও সহিষ্ণু হইয়া চলিতে হইবে। সংস্কার কার্য্য রাতারাতি সম্পাদিত হইতে পারে না, অথবা এক প্রভবের ভিতর ভিন্ন প্রকারের সংস্কারও সার্থক হইয়া উঠে না। কেননা সংস্কারের গতি স্বভাবতই মন্থরা। অতএব সংস্কারক যেমন ধীরোচিত সাহসের সহিত স্বাস্থ্য ব্রতে প্রবৃত্ত হইবেন, সেইরূপ ধীরোচিত নিষ্ঠা এবং কালাপেক্ষিতা সহকারে ব্রত উদ্‌যাপনের জন্যও প্রাণপর্য্যন্ত পণ করিবেন।

সংস্কারকের চতুর্থ লক্ষণ সত্যনিষ্ঠা। সংস্কারক অসত্যকে দূরে পরিহার করিবেন, এবং সত্যকে অবিচলিত ভাবে অবলম্বন করিয়া রহিবেন।

সত্যের নিমিত্ত যদি তাঁহাকে বিলক্ষণ ক্ষতিগ্রস্তও হইতে হয়, তথাপি তিনি তাহাতে তিলমাত্রও বিচলিত না হইয়া সত্যের জয়ঘোষণা করিবেন। যিনি বাহিরে আসিয়া সংস্কারকের পতাকা উত্তোলিত করেন, আর গৃহের ভিতর গৃহিণীর পাদমূলে বসিয়া শত প্রকার কুরীতির প্রশ্রয় দান করিয়া থাকেন, এমত ব্যক্তিকে সংস্কারক নামের কলঙ্ক বলিতে কি আপনাদিগের আপত্তি আছে? সত্যনিষ্ঠা কি কথার কথা? সত্যনিষ্ঠা কি মৌখিক ব্যাপার? যাহা সত্য বলিয়া হৃদয়ে প্রতিভাত হইবে, যাহা বুদ্ধি বিবেকের উজ্জ্বল আলোকে কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্ধারিত হইবে, যদি অকুতোভয়ে তাহা প্রতিপালন করিতে না পার; তবে আবার তোমার সত্যনিষ্ঠা কি? সত্যনিষ্ঠ পুরুষ কাহারও ভয়ে ভীত হয়েন না, কাহারও ভ্রূকুটিতে বিচলিত হয়েন না, অথবা স্তবস্তুতির বিনোদধ্বনি শ্রবণ করিয়াও তিনি বিগলিত হইয়া পড়েন না। মার্টিন-লুথারের তরঙ্গাভিঘাতে যখন ইয়োরোপের বিশাল বক্ষ বিকম্পিত হইয়া উঠিতেছিল, তখন একদিন সেই মহাবীর ওয়ার্মস্ নগরের মহাসভায় স্বীয় পক্ষ সমর্থনার্থ আমন্ত্রিত হইলেন। বলা বাহুল্য, সেই মহাসভাতে ইয়োরোপের যাবতীয় সম্পদ ও শক্তির সমাবেশ হইয়াছিল। এই কারণ তথায় যাইতে লুথারের মিত্রবর্গ বারংবার নিষেধ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের উত্তরে লুথার গর্জ্জন করিয়া বলিলেন,—"তোমরা জানিও যে এই নগরে যত অট্টালিকা আছে, এবং অট্টালিকার ছাদে ছাদে যত ইষ্টক আছে,—আমার শত্রুর সংখ্যা যদি তদধিকও হয়; তাহা হইলেও আমি ওয়ার্মসে গমন করিব।" ইহা শুনিয়া লুথারের মিত্রবর্গ নির্ব্বাক হইয়া রহিলেন। লুথার স্বচ্ছন্দ হৃদয়ে ওয়ার্মসে গমন করিলেন, এবং অসঙ্কুচিত চিত্তে ও অক্ষত দেহে সত্যের জয়ঘোষণা করিতে করিতে ফিরিয়া আসিলেন। আমি বলি ইহারই নাম সত্যনিষ্ঠা। সংস্কারকের

পক্ষে সত্যনিষ্ঠার নিতান্তই আবশ্যক। কারণ সংস্কারককে অমিত বলশালী হইতে হইবে। আর সত্যনিষ্ঠার অভাবে মানবমনে অমিত বলের সঞ্চার কে করিবে?

ইহার পর আত্মবিলয়। সংস্কারক আপনার কৃতিত্ব লইয়া কোলাহল করিবেন না। তাঁহাকে আপনার কৃতিত্বে বা ব্যক্তিত্বে জলাঞ্জলি দিতে হইবে। রাজা রামমোহন রায় যখন এতদ্দেশে ব্রহ্মবাদ পুনরুদ্দীপিত করিবার নিমিত্ত তুমুল আন্দোলন উত্থাপিত করিয়াছিলেন; তখন কোন কোন সুহৃজ্জন আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি কি কোন নূতন ধর্ম্মের প্রবর্ত্তনা করিতেছ? অথবা তুমি কি কোন নূতন ধর্ম্মসংস্থাপক হইবার ইচ্ছা করিতেছ?" এই কথার উত্তরে রামমোহন রায় স্পষ্টাক্ষরে বলিলেন,—"না—আমি কোন নূতন ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত করিতেছি না,—আমি কোন নূতন ধর্ম্মকর্ত্তা হইতে চাহিতেছি না। ইহাতে আমার কৃতিত্ব কিছুই নাই। আমি কেবল বেদবেদান্তাদির আলোচনা দ্বারা বঙ্গদেশে বিলুপ্তপ্রায় ব্রহ্মজ্ঞানের পুনরুদ্দীপনা করিতেছি মাত্র।" ইহা রামমোহন রায়ের মত সংস্কারকের পক্ষে উপযুক্ত কথাই বটে। কেবল রামমোহন রায় কেন? পৃথিবীর প্রায় সকল সংস্কারকদিগের জীবনেই এই কথার সাক্ষ্য পাওয়া যায়। সুতরাং যতক্ষণ তোমার মনে কৃতিত্বলাভের কামনা থাকিবে, যতক্ষণ নূতন একটা কিছু করিয়াছ বা করিতেছ বলিয়া মনে মনে স্পর্দ্ধা করিবে, কিংবা কোন অভিনব পন্থার উদ্ভাবক বলিয়া অভিমানের তীব্রতাপে যতক্ষণ উত্তপ্ত হইয়া রহিবে, ততক্ষণ তুমি নিশ্চয় জানিও যে সংস্কারকের পবিত্র পদবীতে পদার্পণ করিবারও তোমার অধিকার নাই। যদি আত্মবিলয় করিতে পার, তবে সংস্কারক্ষেত্রে অগ্রসর হও, নচেৎ সংস্কারকের পবিত্র পীঠ কলুষিত করিবার প্রয়োজন নাই।

আমি এতক্ষণ সংস্কারকের সাধারণ লক্ষণের কথাই বলিলাম। কিন্তু এতদ্ভিন্ন হিন্দু সংস্কারকের যে আর দুইটি বিশেষ লক্ষণ আছে এখন তাহাই বলিব। সে দুইটি বিশেষ লক্ষণের একটি শাস্ত্রাপেক্ষিতা এবং অপরটি সন্ন্যাস। শাস্ত্রাপেক্ষিতা কাহাকে বলে? শাস্ত্রানুবর্ত্তিতার নাম শাস্ত্রাপেক্ষিতা। শাস্ত্রানুবর্ত্তিতা কি? যাঁহা শাস্ত্রসিদ্ধ তাহা করা, আর যাহা শাস্ত্রসিদ্ধ নহে তাহা না করা। হিন্দু সংস্কারককে শাস্ত্রাপেক্ষী হইতে হইবে কেন? কেননা হিন্দুমাত্রেই স্বভাবতঃ শাস্ত্রবিশ্বাসী। হিন্দুমাত্রেই যে শাস্ত্রবিশ্বাসী তাহার প্রমাণ কি? যেহেতু হিন্দু বেদকে যাবতীয় শাস্ত্রের বা শাস্ত্রজ্ঞানের মূল বলিয়া মনে করেন, এবং বেদের আপ্তত্বে বিশ্বাস করিয়া থাকেন। সুতরাং শাস্ত্রাপেক্ষিতা হিন্দুর একটা স্বাভাবিক ধর্ম্ম। অতএব শাস্ত্রাপেক্ষিতা যে হিন্দু সংস্কারকের পক্ষে অপরিহার্য্য লক্ষণ এখন তাহাই বুঝা গেল। এতদ্ভিন্ন এতদ্দেশীয় সংস্কারের ইতিহাসেও ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পরিদৃষ্ট হইতেছে। শঙ্করাচার্য্য বল, রামানুজ বল, মধ্বাচার্য্য বল, এবং নদীয়ার গৌরাঙ্গ বল সকলেই স্বীয় স্বীয় স্কন্ধে শাস্ত্রাপেক্ষিতার নিশান তুলিয়া হিন্দুর সংস্কারকল্পে অগ্রসর হইয়াছেন। বেদান্ত একখানি অতীব প্রামাণিক গ্রন্থ বলিয়া হিন্দুসাধারণের নিকট পরিগৃহীত। এই হেতু এতদ্দেশীয় প্রায় সকল সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তকেরাই এক এক খানি ভাষ্য বিরচিত করিয়া বেদান্তকে আপন আপন মতের অনুকূলে আনিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজ-সংস্থাপক রাজা রামমোহন রায়ই বা কি করিয়া গিয়াছেন? তিনি জানিতেন যে কেবল সহজ জ্ঞানের আশ্রয় লইয়া এতদ্দেশে কোন ধর্ম্মসম্বন্ধীয় কথা বলা যাইতে পারে না,—তিনি বুঝিতেন যে কেবল আত্মপ্রত্যয়ের বলেই আর্য্যাবর্ত্তে মতবিশেষ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। এই নিমিত্তই তিনি শাস্ত্রাপেক্ষী হইয়াছিলেন, এবং উপনিষদাদি প্রচার দ্বারা শাস্ত্রীয়

ভিত্তির উপর ব্রহ্মবাদ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। সুতরাং হিন্দুর সংস্কারককে শাস্ত্রাপেক্ষী হইতেই হইবে। তাহার পর সন্ন্যাস। বিনা সন্ন্যাসে আর্য্যাবর্ত্তের আচার্য্য বা সংস্কারক হওয়া যায় না। ভারতীয় আচার্য্য-পরম্পরাদিগের চরিতালোচনা করিলে এই কথাই বুঝা যায়। ঐ শোন দেবলোক হইতে শঙ্করাচার্য্য ও মধ্বাচার্য্য প্রভৃতি মহাজনগণ বলিতেছেন—"বিনা সন্ন্যাসে আর্য্যাবর্ত্তের আচার্য্যপদবী গ্রহণ করিও না।" ঐ শোন হিমাচলকন্দরের ও নর্ম্মদাতটের নিমগ্নচিত্ত সিদ্ধগণ বলিতেছেন,—"বিনা সন্ন্যাসে আর্য্যাবর্ত্তের আচার্য্যপদবী গ্রহণ করিও না।" ঐ দেখ গঙ্গা ও যমুনার বহুযুগবাহিনী তরঙ্গমালা আজিও ক্ষীণস্বরে বলিতেছে,—"বিনা সন্ন্যাসে আর্য্যাবর্ত্তের আচার্য্যপদবী গ্রহণ করিও না।" বিষয়াসক্ত বিলাসী ব্যক্তি দেশান্তরের পক্ষে আচার্য্য হইতে পারেন,—দেশান্তরের পক্ষে সংস্কারক হইতে পারেন। কিন্তু বিনা সন্ন্যাসে,—বিনা বৈরাগ্যে আর্য্যাবর্ত্তে ও আর্য্যজাতির মধ্যে কেহ আচার্য্য বা সংস্কারক বলিয়া পরিগণিত হইতে পারেন না। আমি বিলাসের হিল্লোলে দুলিতে থাকিব, দেহের পারিপাট্য লইয়া দিবারাত্র ব্যস্ত থাকিব, বিষয়াসক্তির মদিরায় সর্ব্বদা বিভোর হইয়া রহিব, অথচ স্থলবিশেষে বা গৃহবিশেষে প্রবিষ্ট হইয়া দুই দণ্ড কাল বসিয়াই ব্রহ্মদর্শন করিয়া ফেলিব,—এ ব্যাপার দেশান্তরের পক্ষে সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু ইহা ভারতের পক্ষে যার পর নাই অসম্ভব ও অসঙ্গত। আমি স্বীকার করি রাজা রামমোহন রায় পাণ্ডিত্যে অতি প্রগাঢ় ছিলেন, প্রতিভায় সাতিশয় উজ্জ্বল ছিলেন, মেধা সম্পর্কে অতীব তীক্ষ্ণ ছিলেন, এবং মানসিক বীর্য্যে একজন অসামান্য ব্যক্তি ছিলেন। আমি স্বীকার করি রামমোহন রায় ভারতের এক জন যথার্থ হিতৈষী পুরুষ রামমোহন রায় মাতৃভূমির একজন কৃতী সন্তান, এবং রামমোহন

রায় আমাদিগের ভিতর একজন অসাধারণ ব্যক্তি। কিন্তু তাহা হইলে ও রামমোহন রায় আমাদিগের আচার্য্য বা সংস্কারক নহেন। যেহেতু রামমোহন রায় একজন ভোগী, বিষয়ী ও বিলাসী ব্যক্তি ছিলেন। যে দেশে তপস্বিরাই আচার্য্যপদ পরিগ্রহ করিয়াছেন, যে দেশে সন্ন্যাসিরাই উপদেষ্টাপদবী অধিকার করিয়াছেন, এবং যে দেশে বৈরাগ্য-ব্রতধারী ত্যাগী পুরুষেরাই সমাজের সংস্কার কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়াছেন, সে দেশে বিষয়াসক্ত বিলাসী ব্যক্তিকে সংস্কারক বা আচার্য্যের আসন প্রদান করা কথনই সঙ্গত হইতে পারে না। যাহা হউক এক্ষণে বুঝা গেল যে সংস্কারকের লক্ষণ পাঁচটি, এবং হিন্দু সংস্কারকের লক্ষণ সাতটি। অতএব দেখিতে হইবে আমাদিগের প্রস্তাবিত মহাপুরুষ এই সাতটি লক্ষণাক্রান্ত ছিলেন কি না?

দয়ানন্দ একজন সাতিশয় জাতিপ্রিয় লোক ছিলেন। তিনি আর্য্য-দিগের রীতিনীতি সকল অন্তরের সহিত ভালবাসিতেন। যাহাতে হিন্দুর সাহিত্য, সভ্যতা, শিল্প ও বাণিজ্য প্রভৃতি রক্ষিত ও উন্নত হয়, তন্নিমিত্ত তাঁহার অতিশয় আগ্রহ ছিল। স্বজাতির কোন কলঙ্কের কথা শুনিলে দয়ানন্দ নিতান্ত ব্যথিত হইতেন। এ কথা বোধ হয় আপনা-দিগের ভিতর অনেকেই জানেন যে হিন্দু নাম ঘৃণাব্যঞ্জক, এবং হিন্দুবিদ্বেষী মুসলমানগণ কর্ত্তৃকই এই নাম প্রদত্ত হইয়াছে। এই কারণ দয়ানন্দ ইহার তীব্র প্রতিবাদ করিতেন, এবং যাহাতে এতদ্দেশের অধিবাসিবর্গ হিন্দু নামের পরিবর্ত্তে আর্য্যনামে পরিচিত হয়েন তজ্জন্য তিনি সর্ব্বদাই অনু-রোধ করিতেন। ফলতঃ হিন্দুর কলঙ্করাশি প্রক্ষালিত করিবার নিমিত্ত, হিন্দুর প্রনষ্ট গৌরব পুনরুদ্দীপিত করিবার নিমিত্ত, এবং হিন্দুনাম জ্ঞান ও ধর্ম্মের মহিমায় পুনরায় মহিমান্বিত করিবার নিমিত্তই যাঁহার সাধনা ও তপস্যা; তাঁহার তুল্য জাতিপ্রিয় ব্যক্তি আমরা আর কোথায় পাইব?

তাহার পর জাতিজ্ঞতা। দয়ানন্দ হিন্দুকে যেরূপ বুঝিয়াছিলেন, হিন্দুকে যেরূপ চিনিয়াছিলেন, হিন্দুপ্রকৃতির সহিত যেরূপ পরিচিত হইয়াছিলেন, সেরূপ বুঝিতে চিনিতে বা পরিচিত হইতে অতি অল্প লোককেই দেখা যায়। হিন্দুর সমগ্র সাহিত্যে তাঁহার প্রগাঢ় বুৎপত্তি ছিল। হিন্দুর যাবতীয় শাস্ত্রে তাঁহার সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। সুতরাং হিন্দু মনের ধারাবাহিক ইতিহাস সম্পর্কে দয়ানন্দ বিশিষ্ট অভিজ্ঞ ছিলেন বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। তদ্ভিন্ন তিনি হিন্দুসমাজের সকল স্তরেই স্বচ্ছন্দে গতায়াত করিতেন। কারণ আমরা যেমন স্বামী দয়ানন্দকে সুসজ্জিত প্রাসাদমালায় পদার্পণ করিতে দেখিয়াছি, সেইরূপ দরিদ্রের পর্ণকুটীরে বসিয়াও আমরা তাঁহাকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতে দেখিয়াছি। আমরা যেমন তাঁহাকে মিবার ও মাড়োয়ারের অধীশ্বরগণ কর্ত্তৃক আমন্ত্রিত হইতে দেখিয়াছি, সেইরূপ আমরা তাঁহাকে সামান্য লোকের গৃহে যাইয়াও ধর্ম্মালাপ করিতে দেখিয়াছি। আমরা যেমন ভারতীয় রাজন্যবর্গের দরবারে বেদমহিমা বিঘোষিত করিবার জন্য দয়ানন্দকে দণ্ডায়মান হইতে দেখিয়াছি, সেইরূপ শত সহস্র জটাবল্কলধারী সাধু সন্ন্যাসীদিগের সমক্ষেও বৈদিক ধর্ম্মের জয়ঘোষণায় তাঁহাকে প্রবৃত্ত দেখিয়াছি। সুতরাং জাতিজ্ঞান সম্বন্ধে স্বামী দয়ানন্দের যেমন শক্তি ছিল, সেইরূপ সুবিধা ছিল বলিয়াও বুঝিতে হইবে।

তৃতীয়তঃ অস্তিপ্রিয়তা। অস্তিপ্রিয়তার নিদর্শন স্বামিজীর চরিত্রে ভূরি ভূরি দৃষ্ট হইয়া থাকে। তিনি অস্তিপ্রিয় ছিলেন বলিয়াই নবীনতার বিরোধী ছিলেন। হিন্দুর উন্নয়ন সম্বন্ধে আমাদিগের বিশেষভাবে নূতন কিছু করিবার প্রয়োজন নাই বলিয়াই দয়ানন্দের বিশ্বাস ছিল। হিন্দুর যাহা উপাদান বা অবলম্বন আছে, তাহা সংস্কৃত ও উন্নত করিয়া লইলেই আমাদিগের পক্ষে যথেষ্ট হইবে বলিয়া তিনি মনে করিতেন। এই জন্য

তিনি বলিতেন ব্রহ্মোপাসনার নিমিত্ত নূতন মন্দির প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন কি? কেননা দেশের নানাস্থলে ত শত শত শিবমন্দির বিদ্যমান রহিয়াছে। তোমরা সেই সকল শিবমন্দির হইতে কেবল মূর্ত্তিগুলি সবাইয় ফেলিয়া দাও, এবং ফেলিয়া দিয়া সেই স্থলেই ব্রহ্মোপাসনার ব্যবস্থা কর। তিনি আরও বলিতেন যে এতদ্দেশে অভিনব প্রচারকশ্রেণি প্রস্তুত করিবারই বা আবশ্যকতা কি? কারণ যে সকল অশিক্ষিত ও উদরসর্ব্বস্ব দণ্ডিসন্ন্যাসী ভারতের ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, তাঁহাদিগকে ডাকিয়া আন, এবং ডাকিয়া আনিয়া যথারীতি শিক্ষিত ও দীক্ষিত করিয়া ছাড়িয়া দাও। এমন কি তিনি প্রথমতঃ আর্য্যসমাজ প্রতিষ্ঠারও পক্ষপাতী ছিলেন না। এ বিষয়ে তাঁহার মতামত আমি যতদূর আলোচনা করিয়াছি, তাহাতে আমার বিশ্বাস যে ব্রাহ্মসমাজের সদস্যেরা যদি বেদগ্রহণ করিতেন,—অন্ততঃ বেদের প্রাধান্যও মানিয়া লইতেন, তাহা হইলে স্বামী দয়ানন্দ আর্য্যসমাজ সংস্থাপনার্থ কখনই উদ্যত হইতেন না। বলা বাহুল্য তিনি উপস্থিত বিষয়ে ব্রাহ্মসমাজের সদস্যবর্গের সহিত বিচার ও আলোচনা করিতে ক্রটি করেন নাই। এ সম্পর্কে তাঁহার শেষ চেষ্টা আহাম্মদাবাদে হইয়াছিল। তিনি আহাম্মদাবাদে যাইয়া তথাকার প্রার্থনাসমাজের কর্তৃপক্ষদিগের সহিত আলোচনা উত্থাপিত করিলেন। তিনি কর্তৃপক্ষদিগকে বলিলেন,—"তোমরা বেদ গ্রহণ কর। কারণ বেদ আপ্তবাণী।" কর্তৃপক্ষেরা বলিলেন,—"আমরা এ বিষয়ে চিন্তা ও পরামর্শ করিয়া উত্তর দিব।" চিন্তা ও পরামর্শের পর তাঁহারা বলিলেন—"প্রার্থনাসমাজ বেদ আপ্তবাণী বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন না।" তখন দয়ানন্দ বলিলেন,—"আচ্ছা! বেদ আপ্তবাণী বলিয়া গ্রহণ না কর, কিন্তু ধর্ম্মশাস্ত্র সম্পর্কে বেদের প্রাধান্য স্বীকার করিতে তোমাদিগের আপত্তি কি?" তাহা শুনিয়া

কর্ত্তৃপক্ষেরা বলিলেন,—"এ বিষয়েও আমরা চিন্তা করিব।" সুতরাং দয়ানন্দকে প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতে হইল। কএক দিন পরে কর্ত্তৃপক্ষেরা আসিয়া বলিলেন,—"প্রার্থনাসমাজ বেদের প্রাধান্য স্বীকার করাও সঙ্গত বিবেচনা করেন না।" তখন দয়ানন্দ নিরাশ হইলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন যে বেদপ্রতিষ্ঠা বিষয়ে কি ব্রাহ্মসমাজ কি প্রার্থনা-সমাজ কোন সমাজের প্রতিই কিছুমাত্র ভরসা নাই। তখন তিনি অগত্যা অভিনব সভাস্থাপনে সঙ্কল্পারূঢ় হইলেন, এবং বোম্বায়ে আসিয়া ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের ৭ই মার্চ্চ তারিখে আর্য্যসমাজ প্রতিষ্ঠিত করিলেন। ফলতঃ এতদ্দ্বারা আপনারা এখন বুঝিতে পারিতেছেন যে স্বামী দয়ানন্দ কিরূপ নবীনতার বিরোধী ছিলেন।

দয়ানন্দের সত্যনিষ্ঠাও অলোকসাধারণ। তাঁহার কথা লইয়া যখন কাশীতে ঘোর আন্দোলন চলিতেছিল, তাঁহাকে বিমর্দ্দিত করিবার নিমিত্ত যখন কাশীর চতুর্দ্দিকে আয়োজন হইতেছিল, তাঁহার বৈদিক ধর্ম্মের পতাকা যখন কাশীস্থ দেব-মন্দিরের চূড়াসমূহকে উপহাস করিয়া উড়িতেছিল; তখন তথাকার কএকটি পণ্ডিত এক দিন নিভৃতে আসিয়া বলিলেন,—"স্বামিজি! মূর্ত্তিপূজা লইয়া এত তোলপাড় করিতেছেন কেন? আপনি এ কথাটা ছাড়িয়া দেন, তাহা হইলে আমরা আপনাকে শঙ্করের অবতার বলিয়া গ্রহণ করি।" তদুত্তরে স্বামিজী বলিলেন,—"আমি অবতারপদের প্রার্থী নহি,—আমি সত্যের প্রার্থী। ভারতভূমিতে সত্য প্রতিষ্ঠিত হয় ইহাই আমার একান্ত অভিলাষ।" তখন পণ্ডিতেরা আর বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া চলিয়া গেলেন। এইরূপ কত ঘটনা যে দয়ানন্দের জীবনে ঘটিয়াছে তাহা বলা যায় না। যখন তিনি লাহোর নগরে উপস্থিত হইয়া পঞ্চনদের অধিবাসিবর্গকে বৈদিক ধর্ম্মের অনুকূলে যার পর নাই উত্তেজিত করিয়া তুলিতেছিলেন, তখন একজন

সুশিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত হিন্দুসন্তান স্বামিজীর সহচরদিগের নিকট আসিয়া বলিলেন,—"আপনারা স্বামিজীকে মূর্ত্তিপূজার কথাটা ছাড়িয়া দিতে অনুরোধ করুন, তাহা হইলে জম্বুর মহারাজা তাঁহার প্রতি সাতিশয় তুষ্ট হইবেন।" তাহা শুনিয়া দয়ানন্দ বলিয়া উঠিলেন,—"আমি জম্বুর মহারাজাকে তুষ্ট করিব? না বেদপ্রতিপাদিত ব্রহ্মকে তুষ্ট করিব? তোমরা এরূপ কথা আর আমার নিকট তুলিও না।" জিজ্ঞাসা করি ইহার অপেক্ষা সত্যনিষ্ঠার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত আর কি হইতে পারে? তাহার পর আত্মবিলয়। আত্মবিলয় কি তাহা আমি পূর্ব্বেই বলিয়া আসিয়াছি। এখন আত্মবিলয়ের নিদর্শন দয়ানন্দের জীবনে কিছু পাওয়া যায় কি না তাহা দেখিতে হইবে। আমার বিশ্বাস দয়ানন্দ সরস্বতী আত্মবিলয়ের একটি অত্যুজ্জ্বল প্রতিমূর্ত্তি। কারণ যে দেশে মানুষ কথায় কথায় পরাৎপর পরমেশ্বরের পদবী অধিকার করে, যে দেশে মানুষ কামক্রোধাদির ক্রীতকিঙ্কর হইয়াও আপনাকে "শুদ্ধমপাপবিদ্ধং" পরমেশ্বরের সহিত তুলিত করিতে পারে, যে দেশে বায়স আপনার বিকট কণ্ঠ লইয়াও কোকিলের সমাদর গ্রহণ করিতে চাহে, অধিক কি যে দেশে শিবাগণ সহজেই সিংহের আসন অধিকার করিয়া থাকে, সে দেশে দয়ানন্দ সরস্বতীর মত ব্যক্তি ইচ্ছা করিলেই যে একটা প্রকাণ্ড অবতার হইয়া বসিতে পারিতেন তদ্বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহার সে ইচ্ছা আদৌ ছিল না। কে বলে যে তাঁহার মত পণ্ডিত, তাঁহার মত সন্ন্যাসী, তাঁহার মত ব্রহ্মচারী, তাঁহার মত ত্যাগী, এবং তাঁহার মত তপস্বী ব্যক্তি চেষ্টা করিলে ভারতক্ষেত্রে পরমেশ্বরের পূর্ণাবতার বলিয়া পরিপূজিত হইতে পারিতেন না? কে বলে যে তাঁহার মত সাধু, তাঁহার মত সুধী এবং তাঁহার মত সর্ব্বলোকহিতৈষী ব্যক্তি চেষ্টা করিলে অন্ততঃ পরমেশ্বরের অংশাবতার বলিয়াও পরিগৃহীত হইতে পারিতেন না? চেষ্টা করা ত দূরের কথা। আমার বিশ্বাস তিনি

একটু ইঙ্গিত করিলেই আপনাকে একটা মহাবতার বলিয়া প্রতিষ্ঠিত করিয়া যাইতে পারিতেন। আশ্চর্য্যের বিষয় বোম্বাই নগরে ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে যখন প্রথম আর্য্যসমাজ সংস্থাপিত হইল, তখন সভাসদেরা সমাজের অধিনায়ক হইবার নিমিত্ত তাঁহাকে বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিলেন। তদুত্তরে দয়ানন্দ বলিলেন,—"আমি অধিনায়ক হইবার উপযুক্ত নহি তখন তাঁহারা বলিলেন,—"তবে আপনি সমাজের সভাপতি হউন তাহাতেও তিনি অসম্মতি প্রকাশ পূর্ব্বক বলিলেন,—"আমি তোমাদের মত সমাজের একজন সভ্য হইয়া থাকিবমাত্র।" বলা বাহুল্য এইরূপ অপ্রত্যাশিত কথা শুনিয়া সভাসদেরা বিস্মিত হইয়া রহিলেন। জিজ্ঞাসা করি এই ঘটনা কি আত্মত্যাগের একটা জ্বলন্ত পরিচয় নহে? কেননা তিনি ত ইচ্ছা করিলেই আর্য্যসমাজের অধিনায়ক হইতে পারিতেন। তিনি ত ইচ্ছা করিলেই আর্য্যসমাজের সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উঠিতেন, এমন কি তিনি ত ইচ্ছা করিলেই আর্য্যসমাজকে একাধিপত্যের লীলাস্থল করিয়া তুলিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি তাহা করিলেন না। যেহেতু তিনি আত্মমহিমা প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত পৃথিবীতে আগমন করেন নাই,—তিনি আত্মকৃতিত্বের কোলাহল তুলিয়াও কখন মত্ত হয়েন নাই, এবং আপনাকে একটা ঈশ্বরাদিষ্ট অবতার বলিয়া প্রতিপাদন করিবার উদ্দেশে কোন প্রকার অমানুষিকী লীলারও পরিচয় প্রদান করেন নাই। পক্ষান্তরে বেদ ও বেদাচার্য্য ঋষিদিগের মহিমা প্রতিষ্ঠিত করিবার নিমিত্তই দয়ানন্দ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, এবং পদে পদে ঋষিদিগের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াই চলিয়াছিলেন। সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে যে তাঁহার সমগ্র জীবনের সমস্ত কার্য্যই বৈদিক পন্থার অনুবর্ত্তন মাত্র। তাই বলিতেছিলাম দয়ানন্দের মত আত্মবিলয়ের অপূর্ব্ব উদাহরণ আর কে দেখাইতে পারিবেন?

এখন শাস্ত্রাপেক্ষিতা ও সন্ন্যাসের কথা আলোচনা করিতে হইবে। শাস্ত্রাপেক্ষিতার প্রসঙ্গে অবশ্য এ কথা বলা উচিত যে দয়ানন্দ সংস্কৃত ভাষায় লিখিত গ্রন্থমাত্রকেই শাস্ত্র বলিয়া মানিতেন না। যে সকল গ্রন্থ ভ্রান্ত বুদ্ধিতে বিরচিত, যে সকল গ্রন্থ মানবীয় কল্পনায় পরিপূরিত, সে সকল গ্রন্থকে তিনি কোন প্রকারেই শাস্ত্র বলিয়া স্বীকার করিতেন না। পক্ষান্তরে বেদ ও বেদানুকূল গ্রন্থমাত্রই তাঁহার নিকট শাস্ত্র বলিয়া স্বীকৃত ও সম্মানিত হইত। সুতরাং তাহার শাস্ত্রাপেক্ষিতাকে বেদাপেক্ষিতাও বলিতে পার। যাহা হউক দয়ানন্দের শাস্ত্রাপেক্ষিতা কেবল ধর্ম্মপ্রচারে বা তর্কক্ষেত্রেই আবদ্ধ থাকিত না। জীবনের যাবতীয় কার্য্যেই দয়ানন্দ শাস্ত্রাপেক্ষী হইয়া চলিতেন। কি বিচারে, কি ভাষ্যে, কি ভাষণে, কি অপরাপর আচরণে তিনি সকল স্থলেই শাস্ত্রের সম্মান রক্ষা করিতেন। শাস্ত্রের প্রতি দয়ানন্দের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা,—বেদের প্রতি দয়ানন্দের অবিচলিত বিশ্বাস। সুতরাং যাহা বেদপ্রসিদ্ধ দয়ানন্দ তাহা মানিতেন, আর যাহা বেদবিরুদ্ধ দয়ানন্দ তাহা প্রাণান্তেও মানিতেন না। তিনি মূর্ত্তিপূজার ঘোর বিরোধী ছিলেন। কারণ মূর্ত্তিপূজার কথা বেদে নাই। মূর্ত্তিপূজা অযুক্তিসিদ্ধ বা বিজ্ঞানবিরুদ্ধ বলিয়া তিনি তত কিছু আপত্তি করিতেন না,—কিন্তু মূর্ত্তিপূজা বেদবিরুদ্ধ বলিয়াই তিনি ঘোরতর আপত্তি করিতেন। অধিক কি তজ্জন্যই তিনি মূর্ত্তিপূজার মূলোচ্ছেদনে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। দয়ানন্দ নিয়োগ মানিতেন, কারণ নিয়োগের কথা বেদে আছে। দয়ানন্দ বিধবাবিবাহ মানিতেন, কারণ বিধবাবিবাহের ব্যবস্থা বেদে রহিয়াছে। দয়ানন্দ জন্মান্তরবাদী ছিলেন, কারণ জন্মান্তরবাদ বেদে কথিত হইয়াছে। দয়ানন্দ অর্ণবযানযোগে দূরদূরান্তরে গমন করাও বিধেয় বিবেচনা করিতেন, কারণ সমুদ্রযাত্রা বেদে সমর্থিত হইয়াছে। এইরূপ বেদানুগামিতার উপরেই দয়ানন্দ আপনার সমস্ত কার্য্য এবং সমগ্র

'মতামত প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় সেই মহাপুরুষ মুমূর্ষু শয্যায় শায়িত থাকিয়াও শাস্ত্রের সম্মান রক্ষা করিয়া গিয়াছেন! যেহেতু দয়ানন্দ যখন মৃত্যুশয্যায় শায়িত, শোকাকুল শিষ্যদল-পরিবৃত হইয়া দয়ানন্দ যখন আজমীর নগরে অবস্থিত, হৃদয়ের শেষ স্পন্দনের প্রতীক্ষায় দয়ানন্দ যখন সমাহিত, এবং ইহলোকের পৃষ্ঠে এক পদ স্থাপন করিয়া পরলোকের পৃষ্ঠে অপর পদ স্থাপন করিবার নিমিত্ত দয়ানন্দ যখন উদ্যত তখন একজন শিষ্য তাঁহার দিকে চাহিয়া শোকার্ত্ত কণ্ঠে বলিলেন,—"আপনার শব প্রোথিত করিবার নিমিত্ত কতকগুলি সন্ন্যাসী আসিয়া অপেক্ষা করিতেছেন।" তাহা শুনিয়া দয়ানন্দ ক্ষীণস্বরে বলিলেন—"তাহা যেন না হয়। মানুষের দেহ প্রোথিত করা বিধেয় নহে। কারণ বেদে কথিত হইয়াছে,—"বায়ুরনিলমমৃতমথেদং ভস্মান্তং শরীরং"। অতএব তোমরা আমারি শরীর ভস্মীভূত করিয়া ফেলিবে।" ইহা অপেক্ষা বেদবিশ্বাসের জ্বলন্ত পরিচয় আর কি হইতে পারে? যিনি মৃত্যুর নিদারুণ যন্ত্রণার মধ্যেও বেদমহিমা বিঘোষিত করেন, মৃত্যুর করালগ্রাসে গ্রাসিত হইয়াও যিনি শাস্ত্রবিধি মানিয়া চলেন, এবং মৃত্যুর পরেও যিনি তাঁহার সম্বন্ধে শাস্ত্রশাসন অক্ষুণ্ণ রাখিয়া চলিতে উপদেশ দিয়া থাকেন, তাঁহার মত শাস্ত্রাপেক্ষী বা বেদবিশ্বাসী আচার্য্য ভারতে কয়জন জন্মগ্রহণ করিয়াছেন? দয়ানন্দ তুমি ধন্য! তোমার বেদবিশ্বাসও ধন্য! তুমি মথুরাধামে জ্ঞানবৃদ্ধ বিরজানন্দের হস্ত হইতে সেই যে বৈদিক ধর্ম্মের বিজয়পতাকা গ্রহণ করিয়া স্বীয় স্কন্ধে ধারণ করিয়াছিলে, আশ্চর্য্যের বিষয় একদিনের নিমিত্তও সেই পতাকা পরিত্যাগ করিলে না,—এমন কি মৃত্যুর শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্তও রোগজীর্ণ স্কন্ধে এবং কম্পান্বিত হস্তে সেই পতাকা ধারণ করিয়া ভারতে বেদপ্রাণতার অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত দর্শন করাইলে। সুতরাং তোমার শাস্ত্রাপেক্ষিতা অলৌকিক।

তাহার পর সন্ন্যাসের কথা। সন্ন্যাসের প্রায় সকল লক্ষণই দয়ানন্দে বিদ্যমান ছিল। ধনে তাঁহার আস্থা ছিল না। মানে তাঁহার দৃষ্টি ছিল না। স্তুতিনিন্দায় তিনি বিচলিত হইতেন না। শীতগ্রীষ্মে তিনি কাতর হইয়া পড়িতেন না। যে শীতে মানুষ থরহরি কম্পান্বিত হয়, যে গ্রীষ্মে মানুষ স্খলদ্ঘর্ম্ম-কলেবর হইয়া পড়ে, দয়ানন্দ সে শীতে বা সে গ্রীষ্মে কিছুমাত্রও বিচলিত হইতেন না। আমি শুনিয়াছি যে তিনি যেমন শীতঋতুর নীহারময়ী রাত্রিতে কেবল কতকগুলি তৃণাচ্ছাদিত হইযাই গঙ্গার তটে শুইয়া থাকিতেন, সেইরূপ নিদাঘের প্রচণ্ডতাপেও তিনি প্রান্তরমধ্যে অক্লেশে পড়িয়া রহিতেন। কি শীতাতপ, কি বাত্যাবৃষ্টি, কি অল্পাহার, কি অনাহার, কি পথক্লেশ, কি পর্য্যটনক্লেশ কিছুতেই দয়ানন্দের দৃকপাত ছিল না। কি সামাজিক উপদ্রব, কি প্রাকৃতিক উপদ্রব কোন উপদ্রবেই দয়ানন্দের ব্রতভঙ্গ হইত না। কি সজনে, কি নির্জ্জনে, কি কুটীরে, কি প্রাসাদে, কি রাজেন্দ্রসঙ্গমে, কি সাধুসম্মিলনে কোন স্থলেই দয়ানন্দ সন্ন্যাসনীতি অতিক্রম করিয়া চলিতেন না। কে না জানে দয়ানন্দের যশোদুন্দুভি সমগ্র ভারতে বাজিয়া উঠিয়াছিল? কে না জানে তাঁহার প্রতিভালোকে চতুর্দ্দিক সমুদ্ভাসিত হইয়াছিল? কে না জানে তাঁহার অলৌকিক পাণ্ডিত্যদর্শনে আর্য্যাবর্ত্ত ও দাক্ষিণাত্য বিমোহিত হইয়া গিয়াছিল? কিন্তু তাহা হইলেও একদিনের জন্য তিনি অভিমানের মদিরা-স্পর্শে প্রমত্ত হইয়া উঠেন নাই, অথবা একদিনের নিমিত্তও তিনি সন্ন্যাস-ধর্ম্মের অতিক্রম করিয়া চলেন নাই। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে একটু কৌশল অবলম্বন করিলেই দয়ানন্দ ভারতের রাজন্যবর্গকে আপনার মন্ত্র-শিষ্য করিয়া তুলিতে পারিতেন। সেই সূত্রে তিনি সহস্র সহস্র মুদ্রার অধি-স্বামীও হইতে পারিতেন, এবং অপরাপর সন্ন্যাসীর মত সুবর্ণময় সুচারু পর্য্যঙ্কে শয়ন ও উপবেশন পূর্ব্বক তিনি সাংসারিক সকল প্রকার সুখের

রসাস্বাদ করিতেও সমর্থ হইতেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় তিনি যে দিগম্বর সন্ন্যাসী সেই দিগম্বর সন্ন্যাসী থাকিয়াই * ভারতের সেবাব্রতে ব্যাপৃত হইয়াছিলেন। যাহা হউক হিন্দু সংস্কারকের লক্ষণ সম্বন্ধে এতক্ষণ যাহা ব্যক্ত হইল, তদ্দ্বারা সুনিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হইতেছে যে স্বামী দয়ানন্দ সর্ব্বতোভাবেই হিন্দু সংস্কারকের উপযুক্ত। কিন্তু আমি তাঁহাকে কেবল হিন্দু সংস্কারক বলিতে চাহি না,—আমি তাঁহাকে হিন্দুর আদর্শ সংস্কারক বলিতে চাহি। এই কারণ উপস্থিত বিষয়ে আমাকে তাঁহার আদর্শত্ব প্রতিপাদন করিতে হইবে।

ভারতের যে সকল আচার্য্য অতীত ইতিহাসে সংস্কারক নামে পরিচিত হইয়াছেন, আমার বিবেচনায় তাঁহাদিগের মধ্যে শঙ্করস্বামীই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কিন্তু সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইলেও শঙ্কর আদর্শ সংস্কারক নহেন। কেননা একাঙ্গীন সংস্কারকেরা আদর্শ সংস্কারক হইতে পারেন না। এ কথা আমি অবশ্যই স্বীকার করিব যে যখন বৌদ্ধদিগের প্রতাপে ভারতের চতুর্দ্দিক কম্পিত হইতেছিল, যখন বৌদ্ধসমাজ তীব্র ভাবে বেদের নিন্দাবাদ করিতেছিল, এবং বেদ বৌদ্ধরূপ রাহুকবলে যখন অল্পে অল্পে কবলিত হইতেছিল, তখন শঙ্করাচার্য্য আবির্ভূত হইয়া অসাধারণ তেজস্বিতা ও তর্কশক্তির প্রভাবে বেদের উদ্ধারসাধন করিয়াছিলেন। যদি বল তিনি কেবল বেদের উদ্ধারসাধন করেন নাই,—অধিকন্তু বেদান্তের ভাষ্যপ্রচার দ্বারা তিনি ব্রহ্মবাদেরও সংস্কার করিয়াছিলেন। তাহা হইলে আমি বলিব যে সে কথা

* স্বামী দয়ানন্দ প্রথমাবস্থায় সর্ব্বাঙ্গে ভস্মলেপন করিয়া দিগম্বর বেশেই বিচরণ করিতেন। তিনি যখন কলিকাতায় আসিয়াছিলেন, তখন এখানকার লোকেরা তাঁহার দিগম্বর মূর্ত্তিই দর্শন করিয়াছিল। কিন্তু রেলওয়ে যাতায়াতে এবং প্রায়ই সভাসমিতিতে উপস্থিত হওয়াতে তাঁহাকে উত্তরীয়াদি বস্ত্রাদি পরিধান করিতে হইত।

ঠিক নহে। কারণ তাঁহার বেদান্ত-ভাষ্যকে ব্রহ্মবাদের সংস্কার না বলিয়া ব্রহ্মবাদের একরূপ অভিনব ব্যাখ্যা বলাই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। না হয় স্বীকার করিয়া লইলাম যে শঙ্করাচার্য্য এক দিকে যেমন বেদোদ্ধারক, অপর দিকে সেইরূপ ব্রহ্মবাদেরও সংস্কারক। কিন্তু তাহা হইলেই বা কি? তাহা হইলেই কি আমরা তাঁহাকে আদর্শ সংস্কারক বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি? আমি জানিতে চাহি যে যাহাতে বিকৃত সমাজ প্রকৃতিস্থ হয়, যাহাতে মনুষ্যের শারীরিক মানসিক ও আধ্যাত্মিক কল্যাণ সাধিত হয়, যাহাতে বিচ্ছিন্ন ও বিভক্তীকৃত জাতি একতা-সূত্রে সম্বদ্ধ হয়, এবং যাহাতে সকলেই সাম্প্রদায়িক বিরোধ ভুলিয়া গিয়া সৌহার্দ্দরূপ সাগরসঙ্গমে সম্মিলিত হয় তাহার জন্য শঙ্করাচার্য্য কি করিয়াছেন? আমি জানিতে চাহি যাহাতে বর্ণাশ্রম-প্রণালী সর্ব্বতোভাবে সুরক্ষিত হয়, যাহাতে হিন্দুর শিল্প উন্নত হয়,—বাণিজ্য প্রসারিত হয়, যাহাতে হিন্দুর স্বাস্থ্য ও সম্পদ উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হয়, এক কথায় যাহাতে সকল অংশে দৃঢ়িষ্ঠ ও বলিষ্ঠ হইয়া উঠিয়া হিন্দু আবার জগতের সমক্ষে বিস্ফারিত বক্ষে দণ্ডায়মান হইতে সমর্থ হয় তাহার জন্যই বা শঙ্করাচার্য্য কি করিয়া গিয়াছেন? কেবল "নলিনীদলগত জলবত্তরলং" বলিয়া কোন জাতি উঠিতে পারে না। কেবল অদ্বৈতবাদ লইয়াও কোন সমাজ দাঁড়াইতে পারে না। অথবা শুদ্ধাদ্বৈতবাদ শুদ্ধাদ্বৈতবাদ বলিয়া চীৎকার করিলেও কোন মৃত জাতির প্রাণে সঞ্জীবনী শক্তির সঞ্চার হয় না। আমি বলি সে চিকিৎসা চিকিৎসাই নয়,—যে চিকিৎসায় চিকিৎসিত ব্যক্তির সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সুস্থ ও সবল না হয়। সেইরূপ আমি বলি সে সংস্কার সংস্কার নামের উপযুক্তই নয়,—যে সংস্কারে জাতিবিশেষ সর্ব্বাবয়বে উন্নত বা পরিপুষ্ট না হয়। সেই জন্যই আমি বলিয়াছি যে আদর্শ সংস্কারককে সর্ব্বাঙ্গীন সংস্কারক হইতে হইবে।

দয়ানন্দ হিন্দুর আদর্শ সংস্কারক। কেন না দয়ানন্দ হিন্দুর সর্ব্বাঙ্গীন সংস্কারের চেষ্টা করিয়াছেন। দয়ানন্দ কেবল ভারতের ধর্ম্মসংস্কারক নহেন। তিনি আমাদিগের সমস্ত বিষয়েরই সংস্কারক। দয়ানন্দ প্রদেশ-বিশেষের নিমিত্ত দণ্ডায়মান হয়েন নাই, তিনি হিন্দুর শাখাবিশেষের কল্যাণার্থী হইয়া আগমন করেন নাই, কিংবা তিনি হিন্দুজীবনের অঙ্গবিশেষ লইয়াও আলোচনা করিয়া যান নাই। পক্ষান্তরে তিনি সমগ্র হিন্দুস্থানকে হৃদয়ে ধারণ করিয়াছিলেন, তিনি সমগ্র হিন্দুর হিতচিন্তনেই প্রবৃদ্ধ হইয়াছিলেন, এবং হিন্দুজীবনের আদ্যোপান্তেই আপনার দৃষ্টি নিয়োজিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। এ কথায় বিশ্বাস করিতে যদি কাহারও প্রবৃত্তি না হয়, তবে তিনি দয়ানন্দের গ্রন্থাবলী আলোচনা করুন। তাহা হইলে জানিতে পারিবেন যে কি সমগ্রগ্রাহিতা সহকারে সেই সন্ন্যাসী পুরুষ ভারতের সংস্কারকল্পে জীবনোৎসর্গ করিয়াছিলেন। আমাদিগের বহুযুগ-সঞ্চিত আবর্জ্জনারাশি কিরূপে বিদূরিত হইবে, আমাদিগের নির্জ্জীব সমাজ কিরূপে সজীব হইয়া দাঁড়াইবে, ভারতের সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ কিরূপে নির্ব্বাপিত হইয়া যাইবে, এবং এই মতবিচ্ছিন্ন ও শাস্ত্রবিচ্ছিন্ন দেশে একতার শক্তি কিরূপে সম্প্রসারিত হইবে ইত্যাদি বিষয় দয়ানন্দ যেমন তন্ন তন্ন রূপে আলোচনা করিয়াছেন; সেইরূপ কি উপায়ে হিন্দুর শিল্প রক্ষিত হইবে,—বাণিজ্যের প্রসার ঘটিবে, কি উপায়ে ভারতের অর্থ ভারতেই থাকিয়া যাইবে, এবং কি উপায় অবলম্বন করিলে ভারতের গবাদি পশু সকল রক্ষিত ও কৃষির অবস্থা উন্নত হইবে তৎসম্বন্ধেও তিনি সবিশেষ চিন্তা এবং চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। দয়ানন্দের যেমন ধ্রুব বিশ্বাস ছিল যে বেদানুশাসন না মানিলে হিন্দুর হিন্দুত্ব থাকিবে না,—বর্ণাশ্রম রক্ষা করিয়া না চলিলে যেমন হিন্দু প্রকৃতির স্ফূর্ত্তি হইবে না, সেইরূপ তাঁহার ধ্রুব বিশ্বাস

ছিল যে ভারতের গোধন সকল রক্ষিত না হইলে হিন্দু কোনরূপেই হিন্দু হইয়া থাকিতে পারিবেন না। দয়ানন্দ সেই নিমিত্তই গোরক্ষার আন্দোলন উত্থাপিত করিয়া গিয়াছেন।* জাতীয় শিল্পরক্ষার দিকেও দয়ানন্দের প্রখর দৃষ্টি ছিল। তিনি এই বিষয়ে দেশীয় ধনাঢ্য লোকদিগকে উৎসাহিত কবিবার চেষ্টা কবিতেন। তিনি যখন দেখিতেন যে ভারতভূমির শিল্পিগণ দুর্দ্দশায় দিনপাত কবিতেছে, ভাবতের শিল্পজাত সামগ্রী সকল দিন দিন বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে, এবং অপবদিকে বিদেশীয় বণিকগণের উপর্য্যুপরি আবির্ভাবে হিন্দুব গৃহে গৃহে বিদেশীয় সামগ্রীসমূহ আদৃত ও সজ্জিত হইতেছে, তখন সেই সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী পুরুষ কেবল আক্ষেপ প্রকাশ করিয়াই নিবস্ত থাকিতে পাবিতেন না, অধিকন্তু তিনি শোকাহত ব্যক্তির ন্যায় সাতিশয় ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িতেন।† কেবল স্থূল ক্রিয়ার কথা নহে,—দয়ানন্দ হিন্দুর সূক্ষ্ম তত্ত্বসমূহেরও আলোচনা করিতে ত্রুটি কবেন নাই। হিন্দু কি ভাবে পুত্রোৎপাদন কবিবেন, গর্ভস্থ পুত্রকে কি ভাবে রক্ষা করিবেন, প্রসূত হইলে পর পুত্রের

---

* স্বামী দয়ানন্দ কেবল গোরক্ষার আন্দোলন তুলিয়া যান নাই। যাহাতে সেই আন্দোলন স্থায়ী ভাবে কার্য্য কবিতে পারে, তন্নিমিত্ত তিনি গোকৃষ্যাদি-রক্ষিণী নামে একটি সভা স্থাপন করিয়া গিয়াছেন।

† স্থানীয় [illegible] আদালতের অন্যতম জজ শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন চাট্টাপাধ্যায় মহাশয় স্বামিজীর প্রসঙ্গে বক্তার নিকট একবার বলেন যে, তিনি এলাহাবাদের জনৈক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির গৃহে একটি সভায় একদিন আহূত হইয়াছিলেন। সেই সভা দয়ানন্দের উপলক্ষেই হইয়াছিল। সেই সভায় দয়ানন্দ আর্য্যশিল্পের অধোগতি বিষয়ে অনেক কথা বলিয়া আক্ষেপ প্রকাশ করিয়াছিলেন। এমন কি চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলেন যে, আক্ষেপ প্রকাশ করিবার সময় স্বামিজীর মুখ দেখিয়া মনে হইল যেন তিনি জাতীয় শিল্পের অবনতির জন্য মর্ম্মান্তিক ক্লেশ বোধ করিতেছেন।

শারীরিক মানসিক ও আধ্যাত্মিক কল্যাণের জন্য কি কি উপায় অবলম্বন করিবেন, এক কথায় হিন্দু প্রসূতি গৃহ হইতে শ্মশানভূমি পর্য্যন্ত কি ভাবে চলিবেন—কি প্রণালীতে জীবন অতিবাহিত করিবেন, এবং কি প্রণালীতে জীবন অতিবাহিত করিলে পর জীবনের প্রকৃত আদর্শে উপনীত হইয়া অজ্ঞানান্ধকারের পর-পারবর্ত্তী সেই জ্যোতির্ম্ময় লোকে গমন করিতে পারিবেন ইত্যাদি তত্ত্বও স্বামী দয়ানন্দ বিস্তারিত ভাবে মীমাংসা করিয়া গিয়াছেন। তিনি যেমন ব্যক্তিগত ভাবে হিন্দুর উন্নয়নের চেষ্টা করিয়াছেন, সেইরূপ সমাজগত এবং জাতিগত ভাবেও তিনি হিন্দুকে উত্তোলিত করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। ফলতঃ তিনি কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, সাহিত্য, সম্পদ, দেহ, মন, আত্মা প্রভৃতি সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সহকারে সমগ্র ভাবে হিন্দুর উন্নতি ও উদ্ধারের নিমিত্ত আপনার সমস্ত শক্তি ও সাধনা উৎসর্গীকৃত করিয়া স্বীয় জীবনে সংস্কারকের আদর্শত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছেন। বস্তুতঃ কি ভারতের কোন আচার্য্যই, কোন সংস্কারকই, অথবা কোন হিতৈষী ব্যক্তিই দয়ানন্দের মত সূক্ষ্মভাবে সমগ্রভাবে ও সর্ব্বাঙ্গীনভাবে আমাদিগের উন্নয়নের নিমিত্ত চেষ্টা করিয়া যান নাই। সুতরাং দয়ানন্দ সরস্বতীই যে হিন্দুর আদর্শ সংস্কারক তাহা এখন প্রতিপন্ন হইল। বর্ত্তমান কাল গ্রহণ করুক আর নাই করুক, সকলে স্বীকার করুন আর নাই করুন, কিন্তু এমত সময় সমাগত হইবে যখন পৃথিবীর যাবতীয় জ্ঞানোন্নত জাতিই এই মহাপুরুষকে মনুষ্যের প্রকৃত পথপ্রদর্শক বলিয়া অভিবাদন করিবেন। এমত সময় শীঘ্রই আসিবে যখন গুজরাট প্রদেশীয় এই উদীচ্য ব্রাহ্মণ-সন্তানের শিক্ষা ও উপদেশানুসারে চলিতে পারিলেই মানবজীবনের সার্থকতা সাধিত হইবে বলিয়া সকলে বিশ্বাস করিবেন।

কিন্তু সে ত দূরের কথা;—সে ত ভবিষ্যতের কথা;—সে ত সমস্ত

মনুষ্যজাতির কথা। সুতরাং সে কথার আলোচনায় আমাদিগের এখন বিশেষ লাভ কি? আমরা এখন চাই উঠিতে,—আমরা এখন চাই জাগরিত হইয়া দাঁড়াইতে,—আমরা এখন চাই মনুষ্যের মত মনুষ্যলোকে বিচরণ করিতে। দেখ জগতের ইতিহাস হইতে আজিও হিন্দুনাম বিলুপ্ত হইয়া যায় নাই। দেখ শত সহস্র বৎসরের ঝঞ্ঝাবাতেও হিন্দু আপনার অস্তিত্ব বিসর্জ্জন করেন নাই। হিন্দু পাঠানের শাসনে নিষ্পেষিত হইয়াছেন, হিন্দু মোগলের অধীনে শত শত বৎসর কাল অতিবাহিত করিয়াছেন, এবং হিন্দু এখন ইংরাজের সর্ব্বগ্রাসিনী শক্তির আশ্রয়ে অবস্থিতি করিতেছেন। কিন্তু হিন্দু হিন্দুই আছেন। ইংরাজ যে জাতির মধ্যেই প্রবেশ করিয়াছেন, সেই জাতিকেই বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিয়াছেন—অন্ততঃ তুলিবার চেষ্টাও করিয়াছেন। ইংরাজ হংকঙ্গে যাইয়া হংকঙ্গের অধিবাসিদিগের সহিত মিশিয়া এমত এক অভিনব জাতির সৃষ্টি করিয়াছেন,—যাহারা হংকঙ্গের অধিবাসীও নহে এবং ইংরাজও নহে। ইংরাজ নবাধিকৃত ব্রহ্মদেশের অধিবাসিবর্গের সহিত মিলিয়া মিশিয়া এমত একটি অপূর্ব্ব জাতির সঞ্চার করিতেছেন,—যাহারা ব্রহ্মবাসী বলিয়া গণ্য হইবে না এবং ইংরাজ বলিয়াও পরিগণিত হইতে পারিবে না। কিন্তু ইংরাজের এই জাতিবিপর্য্যয়ের চেষ্টা ভারতে সর্ব্বতোভাবেই ব্যর্থ হইয়া রহিয়াছে। ইংরাজ এতদ্দেশে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, পাঠান মোগলের অপেক্ষাও ইংরাজ দৃঢ়তর রূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া বসিয়াছেন, এমন কি ইংরাজ আপনার শিক্ষা, সংস্কার ও সভ্যতামন্ত্রে হিন্দুসন্তানকে দীক্ষিত করিবার অভিপ্রায়ে শত শত স্কুল কলেজের দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া বসিয়া রহিয়াছেন। কিন্তু তথাপি ইংরাজ হিন্দুর বিপর্য্যয়সাধন করিতে পারেন নাই, অথবা হিন্দুকে সর্ব্বতোভাবে অহিন্দু করিয়া তুলিতে সমর্থ হয়েন নাই। আজিও দেখ হিন্দু বেদবিধি

মানিয়া চলিতেছেন—আজিও দেখ হিন্দু মন্বাদি মহাজনের পন্থানুসরণ করিতেছেন—আজিও দেখ ভাগীরথীর উভয় তটে ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত হইতে দিবা দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত সহস্র সহস্র হিন্দু বুঝিয়া হউক আর না বুঝিয়াই হউক, শ্রদ্ধার সঙ্গে হউক আর অশ্রদ্ধার সঙ্গেই হউক সেই সর্ব্বার্থ-সাধিনী গরীয়সী গায়ত্রীর আরাধনা করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থম্মন্ত বিবেচনা করিতেছেন। তবে কে বলে হিন্দুর বিলোপ ঘটিবে? কে বলে হিন্দুজাতির উচ্ছেদ হইবে? ক্ষুণ্ণ হিন্দু! তুমি নিরাশ হইও না। বিপন্ন হিন্দু! তুমি আর অশ্রুপাত করিও না। ঐ দেখ অমারাত্রির অবসান হইতেছে। ঐ দেখ তিমিরাবৃত আকাশের পূর্ব্বপ্রান্তে আর্য্যজ্ঞানের আলোকরেখা সঞ্চারিত হইতেছে। ঐ দেখ সেই আলোকসঞ্চারে ভারতের ইতস্ততঃ পরিলক্ষিত হইতেছে। আর ঐ দেখ সেই আলোকের সঙ্গে সঙ্গে গুজরাট প্রদেশের একজন ব্রাহ্মণ পতাকা হস্তে পরিভ্রমণ করিতেছেন। সুতরাং তুমি উত্থান কর। সেই পুরাতন পরব্রহ্মের নাম উচ্চারণ কর, এবং সেই আলোকের সাহায্যে পথ দেখিয়া লইয়া তোমার আলস্য অভিমুখে তুমি গমন কর।

পরিশিষ্ট।

এই সভায় নির্দ্দিষ্ট বক্তার পর কএক ব্যক্তির প্রতি কিছু কিছু বলিবার ভার ছিল। কিন্তু তাঁহাদিগের সকলে সভায় উপস্থিত হইতে পারেন নাই। যাঁহারা উপস্থিত হইয়াছিলেন তাঁহাদিগের মধ্যে শ্রীযুক্ত দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় নিম্নলিখিত প্রবন্ধটি পাঠ করিলেন :—

মহাপুরুষদিগের কথা লইয়া আলোচনা করিলে, আমরা বিবিধ প্রকারে উপকৃত হই। প্রত্যুত তাঁহাদের নাম লইলেও আমাদের পুণ্য সঞ্চয় হয়। আমাদের পূজনীয় শাস্ত্রকারগণ এই ভাবটী বিশেষরূপে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তাঁহাদের আদেশ এই যে, ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে উঠিয়া ঈশ্বর ও ধর্ম্ম চিন্তার পর পূত আত্মাগণকে স্মরণ করিবে। এই জন্য শয্যা হইতে উঠিয়া পুণ্যবান্ ও পুণ্যবতী ব্যক্তিদিগের নাম লইবার প্রথা আমাদের মধ্যে আছে। তাঁহাদের নাম লইবামাত্র, আমাদের মনোমধ্যে তাঁহাদের গুণগ্রাম উদয় হয়, এবং সেই সঙ্গে আমরা তাঁহাদের ভাবে মুগ্ধ হই, এবং যে সকল গুণে তাঁহারা প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন, তাহা অনুকরণ করিতে যত্নবান্ হই।

যে মহাপুরুষের বিষয় আজ আলোচিত হইতেছে, তিনি বর্ত্তমান অব্দের এক জন অসাধারণ ব্যক্তি। কি পাণ্ডিত্যে, কি শাস্ত্রজ্ঞানে, কি মিতাচারে, তাঁহার সদৃশ ব্যক্তি পাওয়া ভার। তিনি বেদ-প্রতিপাদিত ধর্ম্ম প্রচার করিয়া ভারতবর্ষের যথেষ্ট মঙ্গল সাধন করিয়াছেন। বেদ সকল শাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ। আমরা বেদের এতদূর মর্য্যাদা করি যে,কোন

কথার প্রসঙ্গ হইলে আমরা বলিয়া উঠি যে,ইহা কি বেদবাক্য যে ইহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইবে? কিন্তু প্রকৃত পক্ষে, আমাদের মধ্যে বেদের মর্য্যাদা কোথায়? বঙ্গদেশে ন্যায়ের চতুষ্পাঠী আছে, স্মৃতির চতুষ্পাঠী আছে, সাহিত্যের চতুষ্পাঠী আছে, কিন্তু বেদের চতুষ্পাঠী কই? বলিতে মনে কষ্ট হয় যে আমাদের গুরু ও পুরোহিত মহাশয়গণ নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া উপলক্ষে যে সকল বেদমন্ত্র পাঠ করেন, সে সকল বিশুদ্ধ ভাবে উচ্চারণ করিতে পারেন না। উচ্চারণাশুদ্ধি এবং পাঠাশুদ্ধির বিষয় উল্লেখ করিয়া দয়ানন্দ স্বামী যে তারাচরণ তর্করত্ন মহাশয়কে অপদস্থ করিয়াছিলেন তাহা মনে পড়িলে আমাদিগকে অধোমুখ হইতে হয়।

দয়ানন্দ স্বামীর সময়ে ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই বেদচর্চ্চা হ্রাস হইয়াছিল। বঙ্গদেশ ত এসম্বন্ধে অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় নিম্নস্থান পরিগ্রহ করিয়াছিল। বলিতে কি, এক জন বেদবেত্তাও তখন বর্ত্তমান ছিলেন না। দয়ানন্দ স্বামী এখানে একটী বেদ-বিদ্যালয় সংস্থাপন জন্য যত্নবান্ হইয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে তাঁহার এই মহদুদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য কোন ধনশালী ব্যক্তি অগ্রসর হয়েন নাই। যে বেদ সকল শাস্ত্রের শীর্ষ স্থান অধিকার করিয়াছে, যে বেদের বচন সর্ব্বত্রই প্রামাণ্যরূপে গৃহীত হইয়া থাকে, সে বেদের প্রতি অনাদর দেখিলে মনে বড় কষ্ট হয়। যদ্যপি আপনারা বঙ্গদেশকে গৌরবান্বিত করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে বেদ-বিদ্যালয় সংস্থাপন জন্য বদ্ধপরিকর হউন, এবং যে মহাপুরুষ বেদের প্রাধান্য রক্ষার জন্য সবিশেষ যত্ন করিয়াছিলেন তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করুন! দয়ানন্দ সরস্বতী প্রকৃতরূপে সনাতন ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। তিনি বেদপ্রতিপাদিত অনুষ্ঠান সকলের অভিপ্রায় বুঝাইয়া দিয়া আমা-

দের সমধিক উপকার সাধন করিয়াছেন। সৌভাগ্যক্রমে একদা তাঁহার উপদেশ বাক্য সকল শ্রবণ করিয়া আমি কৃতকৃতার্থ হইয়াছিলাম। সে ঘটনাটী স্মরণ হইলে আমার মন আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠে।

২৭ বৎসর পূর্ব্বে, যখন আমি বিষয় কার্য্য উপলক্ষে মোগলসরাই নামক স্থানে অবস্থিতি করিতাম, তখন দয়ানন্দ স্বামী বৈদিক ধর্ম্ম প্রচার জন্য কাশীতে আগমন করিয়াছিলেন। এই সংবাদ পাইয়া আমরা কএক জন বন্ধু তাঁহার আনন্দবাগস্থিত আশ্রমে গমন করতঃ তাঁহার সহিত নানা প্রকার শাস্ত্রালাপ করিয়া অতীব আনন্দিত হইলাম। কিন্তু এ আলাপে আমাদের মন তৃপ্তি লাভ করিল না। স্বামীজির নিকট কত লোক গমন করিতেছে। সকলের সহিতই তিনি আলাপ করিতেছেন, সুতরাং তাঁহার সহি[illegible]ধিক কাল কথোপকথন কি প্রকারে সম্ভব হই[illegible]ত [illegible] আমরা সেই জন্য তাঁহাকে এক দিন মোগলসরাই গমন করিতে [illegible]াধ করিলাম। স্বামীজি কৃপা করিয়া আমাদের কথা শুনিলেন। [illegible]গলসরা[illegible] আগমন হইলে পর, স্বামীজির [illegible] শুশ্রূষা করতঃ [illegible]ামরা তাঁহাকে লইয়া একটী প্রান্তরে গমন করিলাম। তথায় খড়ের একটী বেদী প্রস্তুত হইল। তিনি তাহার উপর উপবেশন করিলেন, এবং আমরা তাঁহার চারিদিকে খড়ের উপর বসিলাম। তাঁহাকে দেখিয়া, আমাদের প্রাচীন কালের ঋষিদিগকে মনে পড়িল। তবে আমরা অতি অপদার্থ বলিয়া মনোমধ্যে আমাদের বড় ঘৃণা হইল। যাহা হউক, আমরা বিনীত ভাবে তাঁহাকে শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতে লাগিলাম, এবং তিনি আহ্লাদের সহিত তাহার প্রত্যুত্তর দিতে লাগিলেন। আমাদের প্রশ্নের ও তাঁহার উত্তরের কথঞ্চিৎ আভাস দিতেছি।

স্বামীজি! বেদে যে যজ্ঞ করিবার বিধান আছে তাহার উদ্দেশ্য কি?

উত্তর। পৃথিবীকে শস্যশালিনী করা যজ্ঞের উদ্দেশ্য। ইহা হইতে ধূম প্রচুর পরিমাণে আকাশে উঠিয়া তাহা মেঘে পরিণত হয়, এবং সেই মেঘ হইতে জল নিপতিত হইয়া ভূমিকে বীজবপনের উপযোগী করিয়া তুলে।

এই কথা শুনিয়া আমরা স্বামীজিকে জিজ্ঞাসা করিলাম, স্বামীজি! কেবল মাত্র কাষ্ঠ হইতে ধূম নির্গত হইয়া যজ্ঞের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে। কিন্তু তাহাতে ঘৃত ও অন্যান্য সুগন্ধযুক্ত দ্রব্য দিবার অভিপ্রায় কি?

উত্তর। এই সকল দ্রব্য দেওয়াতে বৃষ্টির জল মিষ্ট হয়, এবং ইহার সাহায্যে যে শস্য উৎপন্ন হয় তাহা স্বাদযুক্ত হইয়া থাকে।

কএক বৎসর পূর্ব্বে, বারুদের ধূমে মেঘের সৃষ্টি করিয়া বারিবর্ষণের চেষ্টা হইয়াছিল। কিন্তু প্রাচীন ঋষিগণ কত কাল পূর্ব্বে সাত্বিকভাবে এই কার্য্যটীর অনুষ্ঠান করিতেন। সেকালে দুর্ভিক্ষের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, আর্য্যগণ বৃহৎ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেন, এবং যজ্ঞশেষে প্রচুর পরিমাণে বারিবর্ষণ হইলে পৃথিবী শস্যশালিনী হইত। বর্ত্তমান কালে, কোন কোন তত্ত্ববেত্তা লক্ষ্য করিয়াছেন যে, ভীষণ সমরানল নির্ব্বাপিত হইলে পর প্রচুর বৃষ্টি নিপতিত হইয়াছে।

এবম্প্রকার বিবিধ উপদেশ লাভ করিয়া আমরা তৃপ্তিলাভ করিয়াছিলাম। আমরা হিন্দিতে প্রশ্ন করিতাম, আর স্বামীজি তাহার উত্তর সংস্কৃতে প্রদান করিতেন। তিনি এরূপ সহজ ভাষায় বলিতেন যে, আমরা তাহা অনায়াসে বুঝিতে পারিতাম।

অতঃপর শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত কর্তৃক লিখিত প্রবন্ধটি উদ্ধৃত হইল। প্রবন্ধটি এই :—

ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে ভারতবর্ষে এক এক সময়ে এক একটি মহাপুরুষ আবির্ভূত হইয়া, আপনাদের অলোকসামান্য প্রভাবে মাতৃভূমির গৌরববৃদ্ধি করিয়াছেন। সংসারের বিঘ্ন-বিপত্তিতে ইঁহাদের উদ্যম ভঙ্গ হয় নাই। আত্মীয়জনের প্রতিকূলতায় ইঁহারা জ্ঞান-লালসার তৃপ্তিসাধনে পরাঙ্মুখ হয়েন নাই। রাজকীয় বিপ্লব বা রাজ্যের অশান্তিতেও ইঁহারা লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া পড়েন নাই। ইঁহাদের অপূর্ব্ব জ্ঞান-গরিমায় দেশের প্রভূত উপকার হইয়াছে। ইঁহাদের ঈশ্বরপ্রেম, ইঁহাদের বিষয়বৈরাগ্য,সর্ব্বোপরি ইঁহাদের অপার্থিব ভাবে স্বদেশের যেরূপ গৌরব-বৃদ্ধি, স্বদেশীয় জ্ঞানপিপাসু জনগণেরও সেইরূপ ধর্ম্মবলের উপচয় হইয়া… ইঁহারা সংসারক্ষেত্রে দীপ্তিশালী জ্যোতিষ্কস্বরূপ ছিলেন। অনন্ত আকাশপটে অপূর্ব্ব প্রভাময় মহাজ্যোতিষ্ক যেমন অন্ধকার দূর করিয়া সমগ্র জগৎ সমুজ্জ্বল করে, ইঁহারাও সেইরূপ আপনাদের অলৌকিক জ্ঞানপ্রভায় অজ্ঞানান্ধকার দূর করিয়া, লোকের হৃদয় উদ্ভাসিত করিয়াছেন। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে অস্মদ্দেশে এইরূপ একটি মহাপুরুষ আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ইঁহার চরিত অস্মদ্দেশে ধর্ম্ম ও সমাজ সম্বন্ধীয় ইতিহাসের অবশ্য বর্ণনীয় বিষয়ের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে।

দয়ানন্দ সরস্বতী কাটিওয়াড় প্রদেশের অন্তর্গত মর্ভি নামক নগরে ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে উদীচ্য ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা একজন সঙ্গতিপন্ন নিষ্ঠাবান্ হিন্দু ছিলেন। শিবের উপাসনায় তাঁহার বিশিষ্ট অনুরাগ ছিল। যেখানে শিবসংক্রান্ত কোন বিষয় আলোচিত হইত, তিনি সেইখানে যাইয়া তদ্গতচিত্তে বরণীয়দেবের ধ্যানে নিবিষ্ট হইতেন। তিনি পুত্রকে শিবোপাসনায় প্রবর্ত্তিত করিতে যথাশক্তি যত্ন করেন।

তাঁহার এই যত্ন নিষ্ফল হয় নাই। দয়ানন্দ বাল্যকালেই ধর্ম্ম-প্রবণ ছিলেন। পিতার ধর্ম্মাসক্তিতেই তাঁহার ধর্ম্মানুরাগ বর্দ্ধিত হইয়াছিল।

দয়ানন্দ পঞ্চম বর্ষ বয়সে বিদ্যাভ্যাসে প্রবৃত্ত হইয়া, বেদভাষ্যের অনেকাংশ পাঠ করেন। অষ্টম বর্ষে তাঁহার উপনয়ন সম্পন্ন হয়। অনন্তর তিনি যজুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করেন। বিদ্যাভ্যাসে তাঁহার প্রগাঢ় মনঃসংযোগ ছিল। তিনি চতুর্দ্দশ বর্ষ অতিক্রম করিতে না করিতেই ব্যাকরণ, সমগ্র যজুর্ব্বেদ এবং অন্যান্য বেদের অনেকাংশ পাঠ করেন। কিন্তু ইহাতে তাঁহার জ্ঞানলালসা অন্তর্হিত হয় নাই। পুণ্যভূমি বারাণসীতে যাইয়া, বিদ্যাশিক্ষা করিতে তাঁহার বিশিষ্ট আগ্রহ ছিল। কিন্তু পিতার প্রতিকূলতায় সে সময়ে তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধ হয় নাই। যাহা হউক তিনি নিকটবর্ত্তী পল্লী-নিবাসী কোন প্রবীণ অধ্যাপকের নিকটে যাইয়া, বিশিষ্টচিত্তে অধ্যয়ন করেন। ইহাতে নিরুক্ত, নিঘণ্টু, পূর্ব্বমীমাংসা প্রভৃতি তাঁহার আয়ত্ত হয়। এই সময়ে তাঁহার বয়স ১২ বৎসরের অধিক হয় নাই। দয়ানন্দ কিরূপ জ্ঞানপিপাসু ছিলেন, তাহা এই ঘটনায় প্রতিপন্ন হইতেছে।

জ্ঞানতৃষ্ণার সহিত দয়ানন্দের সর্ব্বপ্রকার সাংসারিক বিষয়ে অনাসক্তির বৃদ্ধি হয়। তিনি ভোগাভিলাষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করিয়া ধর্ম্মালোচনায় কৃতনিশ্চয় হয়েন। সুলেখক সুধীবর শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় দয়ানন্দচরিত প্রণয়ন করিয়া অস্মদ্দেশের একটী অভাবমোচন করিয়াছেন। এই গ্রন্থ তাঁহার গবেষণা ও লিপিচাতুর্য্যের প্রকৃষ্ট পরিচয়স্থল। বিষয়বৈরাগ্য সম্বন্ধে দয়ানন্দ স্বয়ং যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাহা উক্ত গ্রন্থ হইতে এই স্থলে উদ্ধৃত হইল,—"আমাদিগের গৃহেই একবার ঘটনাবিশেষ উপলক্ষে নৃত্যগীত হইতেছিল। কিন্তু সেই সময়ে আমার একজন সহোদরা সাংঘাতিকরূপে পীড়িত হয়। আমি

পীড়ার সংবাদ শুনিয়া তাহার শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হইলাম। ইতঃপূর্ব্বে আমি কখন কোন লোককে মৃত্যুযন্ত্রণায় নিপীড়িত হইতে দেখি নাই। ফলতঃ আমি সেই সহোদরার আসন্নদশা দর্শনে একান্ত ব্যথিত হইলাম, এবং মনুষ্যমাত্রকেই যে এইরূপ ভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হইবে, তাহাও বুঝিতে পারিলাম। তাহাকে মুমূর্ষু দেখিবা আমি ভিন্ন পরিবারস্থ সকলেই বিলাপ ও রোদন করিতে লাগিলেন। তজ্জন্য পিতা, এমন কি মাতাও আমাকে পাষাণহৃদয় বলিয়া অভিহিত করিলেন। আমি যে সেই অদৃষ্টপূর্ব্ব ঘটনাদর্শনে যার পর নাই আতঙ্কিত হইয়াছিলাম, এবং তন্নিমিত্তই যে তাঁহাদিগের মত বিলাপ বা অশ্রুপাত করিতে পারি নাই, তাহা বলা বাহুল্যমাত্র। তাহার পর তাঁহাদিগের আজ্ঞানুসারে আমি শয্যায় যাইয়া নিদ্রিত হইবার চেষ্টা করিলাম বটে, কিন্তু কিছুতেই নিদ্রিত হইতে পারিলাম না। যাহা হউক, এইরূপ শোকাবহ ঘটনা আমার সমক্ষে কএকবার সংঘটিত হইলেও আমি তন্নিমিত্ত আমাদিগের দেশের রীতি অনুসারে একবারও শোকপ্রকাশ করিতে পারি নাই। এই কারণ আত্মীয় পরিজনদিগের নিকট আমি নিন্দার পাত্র হইয়াছিলাম। আমার নবম বৎসর বয়ক্রমের সময় পিতামহ বিসূচিকা ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। পিতামহ যখন মুমূর্ষু দশাপন্ন তখন আমাকে আহ্বান পূর্ব্বক আপনার শয্যাপার্শ্বে উপবিষ্ট হইবার নিমিত্ত আদেশ করিলেন, এবং আমার মুখের প্রতি স্থির দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক অবিরল ধারায় অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। আমিও তাঁহাকে তদবস্থ দেখিয়া এতদূর ব্যথিত হইয়া পড়িলাম যে, অতিমাত্র ক্রন্দনে চক্ষুর্দ্বয় স্ফীত করিয়া ফেলিলাম। বস্তুতঃ এই ঘটনার পূর্ব্বে আমি কখন এরূপ রোদন করি নাই। এতদ্ভিন্ন আমাকেও যে এরূপ ভাবে কালগ্রাসে পতিত হইতে হইবে, তাহাও সেই সময়াব পর হইতে চিন্তা করিতে লাগিলাম। মৃত্যুচিন্তা যখন ক্রমশঃ

প্রবলতর হইয়া উঠিল, তখন কি উপায় অবলম্বন করিলে অমরত্বলাভ করা যাইতে পারে, তদ্বিষয় আত্মীয়-বান্ধবদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলাম। স্বদেশস্থ পণ্ডিতগণ আমাকে যোগাভ্যাস করিতে পরামর্শ দিলেন। সুতরাং আমি গৃহ পরিত্যাগে কৃতসংকল্প হইলাম। তৎকালে আমার বয়স বিংশতি বৎসর। আমাকে শান্ত ও স্বচ্ছন্দচিত্ত করিবার উদ্দেশে পিতা জমিদারি কার্য্যের ভারার্পণ করিতে ইচ্ছা করিলেন বটে, কিন্তু আমি তাহাতে সম্মত হইলাম না। পিতা তখন আমাকে বিবাহ-শৃঙ্খলে নিবদ্ধ করিবার নিমিত্ত কৃতসংকল্প হইয়া উঠিলেন। বিবাহের কথা উত্থাপিত হইলে আমি আত্মীয়-বান্ধবদিগকে বলিতাম যে কখনও বিবাহ করিব না। কিন্তু তাঁহারা তাহার প্রতিবাদ করিতেন। বিবাহের নিমিত্ত বান্ধবগণ কর্ত্তৃক যখনই অনুরুদ্ধ হইতাম, তখনই তাঁহাদিগের নিকটে বিবাহের পরিবর্ত্তে গৃহত্যাগের অনুমতি প্রার্থনা করিতাম। দেখিতে দেখিতে এক মাসের ভিতরেই বিবাহোপযোগী সমস্ত বিষয় প্রস্তুত হইয়া উঠিল। আমি তদ্দর্শনে একদিন সায়ংকালে বন্ধুবিশেষের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইবার উপলক্ষ করিয়া গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলাম। নিকটস্থ একটী পল্লীতে রাত্রিযাপন পূর্ব্বক অতি প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া পুনরায় চলিতে লাগিলাম।”

দয়ানন্দ এইরূপে গৃহপরিত্যাগ করিয়া, বিষয়বাসনা-পরিশূন্য যোগাভ্যাসে রত বৈরাগীর অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। তাঁহার দেহে স্বর্ণালঙ্কার ও পরিধানে পট্টবস্ত্র ছিল। তিনি পটবস্ত্র ফেলিয়া দিয়া সামান্য বস্ত্র কিনিয়া পরিলেন। অলঙ্কারগুলিও যোগাভ্যাসের প্রতিবন্ধক বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। দয়ানন্দ এই অবস্থায় যেখানে সাধুদিগের সমাগম হইবে বলিয়া শুনিতে লাগিলেন, নানা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়াও সেই স্থানে উপস্থিত হইতে লাগিলেন। একদা সিদ্ধপুর নামক এক স্থানের

মেলায় যোগবিদ্যাবিশারদ সাধুদিগের সমাগম হইতে পারে বুঝিয়া, দয়ানন্দ সেই স্থানের কোন পরিচিত ব্যক্তির নিকটে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু এই ব্যক্তি দয়ানন্দের অভীষ্টসিদ্ধির সহায়তা না করিয়া গোপনে তদীয় পিতার নিকটে তাঁহার উপস্থিতি সংবাদ পাঠাইলেন। সংবাদ প্রাপ্তিমাত্র পিতা, কতিপয় সিপাহী-প্রহরী লইয়া, সিদ্ধপুরে উপস্থিত হইলেন। তিনি পুত্রের কমণ্ডলু ভাঙ্গিলেন, সামান্য পরিধেয় বস্ত্র ছিঁড়িয়া উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ পরিতে দিলেন। পুত্র কোনরূপে পলায়ন করিতে না পারে এজন্য সিপাহী প্রহরী রাখিয়াদিলেন। প্রহরীরা রাত্রিদিন দয়ানন্দের নিকটে থাকিত। কিন্তু দয়ানন্দ ইহাতেও হতোদ্যম হইলেন না। পিতৃবিভব তাঁহাকে সংসারে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারিল না। পরিজনবর্গের মমতা তাঁহার যোগানুরাগের প্রতিবন্ধক হইল না। বিষয় বাসনা তদীয় হৃদয়ে স্থান পাইল না। বৈরাগ্যের আবেগে তিনি সমগ্র, পার্থিব বন্ধন বিচ্ছিন্ন করিয়া, পুনর্ব্বার গৃহপরিত্যাগে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। অসামান্য অধ্যবসায় ও দৃঢ়তা গুণে তাঁহার সংকল্প পূর্ণ হইল। তাঁহার রক্ষকপ্রহরী নিদ্রিত হয় কিনা, দেখিবার জন্য তিনি সমস্তরাত্রি জাগিয়া কৃত্রিম নাসাধ্বনি করিতে লাগিলেন। এইরূপে উপর্য্যুপরি তিন রাত্রি অতিবাহিত হইল। তাঁহার নাসাধ্বনিশ্রবণে রক্ষক সিপাহী ভাবিত যে, তিনি গাঢ় নিদ্রাভিভূত হইয়াছেন। চতুর্থ রাত্রিতে সিপাহী নিদ্রিত হইয়া পড়িল। দয়ানন্দ এই সুযোগে গৃহপরিত্যাগ করিলেন, এবং নগর অতিক্রম পূর্ব্বক আত্মগোপনের জন্য ঘনসন্নিবিষ্ট পাদপপূর্ণ উদ্যানের একটী বৃক্ষে আরোহণ করিয়া রহিলেন। এইরূপে অনশনে সমস্ত দিন অতিবাহিত হইল। সন্ধ্যাসমাগমে দয়ানন্দ স্বদেশ ও স্বজাতিদিগের নিকটে চিরবিদায় গ্রহণপূর্ব্বক নিরীহ, নির্লিপ্ত যোগীর অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। দয়ানন্দ এই সময়ে যাহা বলিয়া গিয়াছেন তাহা দেবেন্দ্র বাবুর উৎকৃষ্ট গ্রন্থ হইতে অবিকল উদ্ধৃত হইল :—

"আমি সিদ্ধপুরুষ হইতে নর্ম্মদানদীর তীরবর্ত্তী প্রদেশে গমন করি। তথায় যোগানন্দ স্বামীর সহিত আমার সাক্ষাৎ ঘটে। যোগানন্দের সঙ্গে কৃষ্ণশাস্ত্রী নামক জনৈক মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি আমাকে কোন কোন বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করেন, এবং তাহার পর সেই রাজ-গুরুর সহিত বেদাভ্যাস করি। তেইশ কিম্বা চব্বিশ বৎসর বয়ক্রমের সময় চুনোদে এক জন সন্ন্যাসীর সহিত আমার দেখা হইল। শাস্ত্রানু-শীলনের প্রতি আমার প্রগাঢ় আকাঙ্ক্ষা থাকায়, এবং সন্ন্যাসাশ্রম শাস্ত্র-শিক্ষার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধাজনক বিবেচনা করায়, আমি সেই সন্ন্যাসীর সমীপে দীক্ষা গ্রহণ করিলাম। দীক্ষার পর আমি দয়ানন্দ সরস্বতী নামে পরিচিত হইলাম। দুই জন রাজযোগপরায়ণ গোস্বামীর সঙ্গেও আমার সাক্ষাৎ ঘটিল। তাঁহাদিগের সহিত আমি আহাম্মদাবাদে গমন করিলাম। সেখানে একজন ব্রহ্মচারীর সহিত সাক্ষাৎ হইল বটে, কিন্তু আমি তাঁহার সংসর্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক হরিদ্বারাভিমুখে যাত্রা করি-লাম। হরিদ্বারে তখন কুম্ভমেলা উপস্থিত। হিমাচলের যে স্থল হইতে অলকনন্দা প্রবাহিত, আমি হরিদ্বার হইতে সে স্থলে উপস্থিত হইলাম। অলকনন্দার জলে বস্তুবিশেষের আঘাত লাগায় আমার পাদদেশ এইরূপ আহত হইল যে, তাহা হইতে রক্তধারা বাহির হইতে লাগিল। এমন কি, আমি তাহাতে এতদূর ব্যথিত হইয়া উঠি যে, বরফরাশির মধ্যে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করাই আমার পক্ষে বাঞ্ছনীয় বোধ করিলাম। কিন্তু আমার জ্ঞানস্পৃহা যার পর নাই প্রবলা হেতু আমি ঐ কার্য্যে প্রতিনিবৃত্ত হইলাম, এবং মথুরায় বিরজানন্দ নামক সুপণ্ডিত সাধুর নিকট গমন করিলাম। বিরজানন্দ পূর্ব্বে আলোয়ারে থাকিতেন। তাঁহার বয়ক্রম তখন একা-শীতি বৎসর। একদিকে বেদাদি আর্ষগ্রন্থের প্রতি বিরজানন্দের যেরূপ প্রগাঢ় আস্থা ছিল, সেইরূপ শেখর কৌমুদী প্রভৃতি আধুনিক

সমূহের প্রতিও তাঁহার বিশিষ্ট অশ্রদ্ধা ছিল। অধিক কি, তিনি পুরাণ-ভাগবতাদির একান্ত বিরুদ্ধ ছিলেন। আমি তৎসমীপে বেদাদি গ্রন্থের অধ্যয়ন আরম্ভ করিলাম। তথাকার অমরলাল নামক একজন সহৃদয় ব্যক্তি অধ্যয়ন বিষয়ে আমাকে বিশিষ্টরূপে সাহায্য করিতে লাগিলেন। আহার ও গ্রন্থাদি সম্পর্কে মুক্তহস্তে সহায়তার নিমিত্ত আমি অমরলালের নিকট যার পর নাই বাধিত আছি। তিনি আহার বিষয়ে এতদূর যত্নপর হইতেন যে, অগ্রে আমার আহারের ব্যবস্থা না করিয়া দিয়া নিজে আহার করিতেন না। বস্তুতঃ তিনি যে একজন মহদন্তঃকরণ ব্যক্তি তাহাতে আর সংশয় নাই। বিরজানন্দের নিকট পাঠ পরিসমাপ্ত করিয়া আমি আগ্রা নগরে দুই বৎসর কাল অবস্থান করিলাম। আগ্রায় অবস্থিতির সময় সন্দেহভঞ্জনের নিমিত্ত আমি কখন স্বয়ং উপস্থিত হইয়া, কখন বা পত্রদ্বারা গুরুর নিকট নানা বিষয় জিজ্ঞাসা করিতাম।”

এই আত্মবিবরণে দয়ানন্দ স্বামীর বিষয়বৈরাগ্য ও জ্ঞানপিপাসা পরিস্ফুট হইবে। শাক্যসিংহ যেমন ভোগাভিলাষ পরিত্যাগ করিয়া সিদ্ধির জন্য কঠোর ব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন, বিশ্বম্ভর যেমন গৃহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক দুশ্চর সন্ন্যাসধর্ম্মে সংযতচিত্ত হইয়াছিলেন, দয়ানন্দ সেইরূপ তরুণ বয়সে পরমার্থ-তত্ত্বলাভের জন্য কঠোর সন্ন্যাস ব্রত অবলম্বন করেন। তিনি প্রকৃত যোগীর অনুসন্ধানের জন্য কষ্টকে কষ্ট বলিয়াই মনে করেন নাই। সুদূর প্রসারিত হিমাদ্রির তুষারস্তূপে তাঁহার গতিভঙ্গ হয় নাই। দুষ্প্রবেশ অরণ্য, দুরারোহ শৈলমালা, দুস্তর তরঙ্গিনী তাঁহার সম্মুখে পতিত হইয়াছে। তিনি কণ্টকে ক্ষতবিক্ষত, উপলরাশির আঘাতে একান্ত পীড়িত হইয়া, তৎসমুদয় অতিক্রম পূর্ব্বক যোগবিশারদ মহাপুরুষের সাক্ষাৎকার লাভের জন্য একতীর্থ হইতে অন্য তীর্থে এক আশ্রম হইতে অন্য আশ্রমে, একমঠ হইতে অন্য মঠে উপ

নীত হইয়াছেন। যে কোনরূপেই হউক, প্রকৃত তত্ত্ব-নির্ণয় করা তাঁহার জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। চীনদেশীয়, চির দরিদ্র পরিব্রাজকের ন্যায় তিনিও নানাস্থান পরিভ্রমণ করিয়া, নানা অভিজ্ঞ যোগীর শিষ্যত্ব গ্রহণ পূর্ব্বক জ্ঞানপিপাসা চরিতার্থ করেন। তাঁহার সত্যানুসন্ধান প্রবৃত্তি এতদূর বলবতী ছিল যে, তিনি নাড়ীচক্রের লিখিত বিবরণ মিলাইয়া দেখিবার জন্য নদীগর্ভস্থিত গলিত শব উত্তোলিত করিয়া অবিকার চিত্তে ছেদন করিতেও কুণ্ঠিত হয়েন নাই। এইরূপ সত্যানুসন্ধান প্রবৃত্তিতে তাঁহার শাস্ত্রজ্ঞান পরিমার্জ্জিত হইয়াছিল। এইরূপ কঠোর স্বার্থত্যাগ, এবং এইরূপ দুশ্চর ব্রতপালনে তাঁহার প্রকৃতি উন্নত, তাঁহার দৃঢ়তা অবিচলিত এবং তাঁহার মহীয়সী ধর্ম্মনিষ্ঠা অপ্রতিহত রহিয়াছিল। চীনের চিরপ্রসিদ্ধ পরিব্রাজক তত্ত্বজ্ঞান লাভের জন্য চারিদিন একবিন্দু জলপান না করিয়াও, অবিচলিত হৃদয়ে ভীতিপ্রদ দুর্গম মরুভূমি অতিবাহন করিয়াছিলেন। দয়ানন্দও এক এক দিন ক্ষুৎপিপাসায় অবসন্ন হইয়াও হিমগিরির দুর্গম প্রদেশ অতিক্রম করিয়া যোগীদিগের আশ্রমে উপনীত হইয়াছেন। এই সময়ে এক এক খণ্ড বরফমাত্র তাঁহার ক্ষুৎপিপাসা শান্তির অদ্বিতীয় অবলম্বন হইয়াছিল। দুশ্চর ব্রহ্মচর্য্যে আত্মসংযত এবং সর্ব্ব প্রকার অনাসক্তভাবে অবিচলিত না হইলে যে, মহাপুরুষের সম্মানিত পদে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারা যায় না, বুদ্ধ চৈতন্য প্রভৃতি চরিতের ন্যায় দয়ানন্দ চরিতও তাহার সমর্থন করিতেছে।